কনভয়

সঞ্জিত দাস

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
সুরেশ দাস
৩৭/১১ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৭
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
যশোদা মাইতি
লিপি মুদ্রণ
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীরাধাকিষণ টিবিড়িওয়ালা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রাত যত গভীর হচ্ছে আমার অস্থিরতাও তত বাড়ছে। যে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তার ভেতরে যাবার অর্থ বা সামর্থ কোন কিছুই আমার নেই। তবু দাঁড়িয়ে আছি। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নইলে বাজোরিয়া সাহেবের দেখা পাবো না। আর সাহেবের দেখা না পেলে আমার আসল কাজই হবে না।

একটা মোটর এসে থামল। তুজন মহিলা গাড়ী থেকে অলস ভাবে নামলো। রূপসী যুবতী মহিলাদের আঁট-সাঁট পোষাকে আমার অনভ্যস্ত চোখ জোড়া খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অন্যদিকে ঘুরে গেল। সেদিকে বাজোরিয়ার গাড়ী। ড্রাইভার ভ্রমর সিং আমাকে লুকিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছিল। চোখে চোখ পড়তে হঠাৎ থতমত খেয়ে ঘাবড়ে গেল। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। তবু নড়ার উপায় নেই। যে দিকে তাকাই একই দৃশ্য। আঁট-সাঁট পোষাকে উদ্ভিন্ন যৌবন, শিথিল কবরীতে বেল-জুঁইয়ের মালা, লাল ঠোঁটে সাদা সিগারেট, আর হাঁটা-চলায় শ্লথ হেলে-পড়া ভঙ্গি।

আমি অন্যমনস্ক হবার ভান করলাম। নেভি-ব্লু উর্দ্দিপরা হোটেলের দারোয়ান দরজা খুলে শ্যালুট করে সরে দাঁড়াল। যুবতীরা ভেতরে ঢুকে গেল। একটা উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগল। সঙ্গে একঝলক শীতল বাতাস। জুনের ভ্যাপসা গরম। শরীর জুড়িয়ে যায় যেন। তবু উপায় নেই। বত্রিশ

টাকার জোড়া ধুতি আর সস্তা হ্যাণ্ডলুমের সার্ট পরা ফোর্থ ক্লাস ষ্টাফের ভেতরে প্রবেশের অধিকার নেই। দরজার গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা: রাইট অফ্ এ্যাডমিশন ইজ রিজার্ভড।

রামকিশন বাজোরিয়ার হোটেলের নাইটক্লাবের লাইফ মেম্বার। সারা জীবন রিজার্ভড। তাই ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই। যতক্ষণ খুশি টেবিল জুড়ে বসে থাকুন। যত পেগ্ ইচ্ছা পানীয় গলায় ঢালুন। কুছ্ পরোয়া। কই বোল্‌নেবালা নেই। লাগে টাকা দেবে আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী।

সেই আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর চিফ্ এ্যাকাউন্টেন্ট শ্রীনিত্যগোপাল মণ্ডল আমার ভগিনীপতি। অতএব, আমার সাতখুন মাপ। যখন খুশি অফিসে ঢুকছি। তিন বছরের জমানো লেজার খুলে ইচ্ছেমত ট্রায়াল ব্যালেন্স করছি। আবার সন্ধ্যের আগে সার্টের বোতাম খুলে লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে দিব্যি শিষ দিতে দিতে বাড়ী ফিরছি।

এর ওপরেও আবার বাড়তি আব্দার। এখানে যাবো ওখানে যাবো। অবশ্য সবেতেই একষ্ট্রা ফেসিলিটি। বাজোরিয়া না বলতে পারে না। একে ব্যালেন্সিট করি। তার ওপর চিফ এ্যাকাউন্টেন্টের শ্যালক। না দেখলেই মন খারাপ। মন খারাপ হলেই কাজ খারাপ। হিসেবে গোলমাল। সবশেষে প্রফিট ঝুলে পড়বে।

অতএব বাধ্য হয়ে বাজোরিয়া সাহেবকে আড়চোখেও আমার দিকে একটু তাকাতে হয়।

আমার তাতেই লাভ। নেই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল।

গত বছর পাটনা গেছি। এবার আরও দূর—বোম্বাই।

আরও কয়েক মিনিট কাটল। একা দাঁড়িয়ে থাকতে বিশ্রী লাগছে। কারোর জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে যে অস্বস্থি তার মত

বাজে জিনিষ আর নেই।

তবু অপেক্ষা। সুদীর্ঘ অপেক্ষা। অনিশ্চিত অপেক্ষা।

সব অপেক্ষারই মূল্য আছে। আমিও মূল্য পাবো। উচিত মূল্য না পেলেও ক্ষতি নেই। বাজোরিয়া সাহেব ভাল লোক। ঠকাবেন না জানি। সেই আশাতেই অপেক্ষা।

আগামীকাল সকালে বোম্বাই-এর গাড়ী ছাড়বে। আমাকে আজ রাতেই পারমিশান আদায় করতে হবে। প্রাথমিক কাজ শেষ করেই রেখেছি। এখন শুধু চূড়ান্ত ভাবে একবার ঘাড় হেলানো।

রামকিশন বাজোরিয়ার কথা খুব কম বলেন। যতটুকু বলেন তাও পরিস্কার নয়। তরল পদার্থের গুণে কিনা জানি না গলার ভেতর সব সময়েই ঘড়ঘড় করছে। কথা তাই জড়ানো। টেলি-ফোনে কথা বললে একটি বর্ণও বুঝবার উপায় নেই। তবু ঘন ঘন ফোন আসে। অনেককে ফোন করতেও হয়। ছেলেরা থাকলে রামকিশন তাদেরই ফোন ধরতে দেন। গোপন কথা থাকলে নিজে হিন্দী ইংরাজী মিলিয়ে কোনরকমে বুঝিয়ে দেন।

আমরা, যারা ফোর্থ ক্লাসের পর্যায়ে আছি সোজাসুজি বাজোরিয়া সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। ছেলেদের ভায়া হয়ে যেতে হয়। ফলে অনেক সময় কথা বেঁকে যায়। অর্থ বদলে যায়। ভুল বোঝাবুঝিও হয়।

আমার ভগিনীপতি আগেই কথাবার্তা বলে রেখেছেন। আমি এসেছি ফাইন্যাল রায় শুনতে। ছেলেদের এড়িয়ে মালিকের সম্মতি আদায়ের এমন উপযুক্ত জায়গা আর নেই।

যুক্তিটা দিয়েছে ভ্রমর সিং—বাজোরিয়ার নিজস্ব ড্রাইভার। কথাটা তার কাছে পাড়তে সে বলল, হোটেল থেকে বেরুবার সময় সাহেব মহাভারতের কর্ণ হয়ে যান। তখন যে যা প্রার্থনা করে সঙ্গে সঙ্গে তথাস্তু।

আমি সেই ভরসাতেই এসেছি। অবশ্য এতে আপত্তি করার

কিছুই নেই। কোম্পানী কনট্রাক্ট বেসিসে মোটর গাড়ী ডেলিভারি দিতে বোম্বাই যাচ্ছে। আমার আর্জি, আমাকে যাত্রী হিসেবে বোম্বাই পৌঁছে দেওয়া। সেখানে আমার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে যাবো। এতে না করার কিই বা আছে। সব গাড়ীই তো ফাঁকা যাবে। তারই যে কোন একটাতে আমায় তুলে নেওয়া। ব্যাস্। আমারও বেড়ানো হ'ল। কোম্পানীরও গাড়ী পৌঁছে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে যত সহজ বাজোরিয়ার ছেলেদের কাছে তত সহজ নয়। তারা অনেক রকম ভাববে, অনেক হিসেব করবে, এটা সেটা প্রশ্ন করবে, অযথা ভাববার সময় নেবে। তার-পরেও যদি নেহাৎ নেআাঙড়ের মত পেছনে লেগে থাকি তখন ধিক্কারে বাবার কানে কথাটা তুলবে। তাও অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসল ব্যাপারের বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে।

বাজোরিয়া সাহেব দ্বিধায় পড়বেন। হ্যাঁ বা না কিছুই বলবেন না। শেষে হয়ত ছেলেদের মতামতের ওপর ছেড়ে দেবেন। তাহলেই ফ্যাসাদ! ছেলেরা মত দেবে না।

তার চেয়ে এই ভাল। হোটেল থেকে বেরুবার মুখে ফস্ করে কথাটা বলে ফেললেই হল। কর্ণের কবজ-কুণ্ডলের মত হয়ত বা বাজোরিয়া সাহেব পকেট হাতড়ে ক্যাশ টাকা বার করে পথের রাহা খরচই না দিয়ে দেন। তাহলেই মার দেগা কেল্লা। তখন গুলি মারো সাহেবের ছেলেদের। তখন আমিই বা কে, আর ছাতু-বাবু লাটুবাবুই বা কে।

আবার হোটেলের দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে আরও কয়েকজন বেরিয়ে এল। কিন্তু বাজোরিয়া সাহেবের নো পাত্তা।

ব্যাপার কি!

ভ্রমর শিং-এর দিকে আড়চোখে তাকাই। গাড়ীর দরজা খুলে নির্বিকার ভাবে সিটের ওপর পা তুলে দিব্যি বসে আছে। আশ্চর্য্য

এর ধৈর্য্য। আমি ভেবে পাই না কি করে একজন লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন অপেক্ষা করার চাকরী নিয়ে বসে থাকে।

একজন জ্যোতিষির কথা মনে পড়ল। একটা এঁদো গলির ভেতর ছোট ঘরে রাষ্ট্রপতির ছবি লাগানো শুভেচ্ছা বাণী টাঙিয়ে দিনের পর দিন গেরুয়া পরে বসে থাকতে দেখি। কচ্চিৎ কখনো একটা দুটো লোক ভুল করে হয়ত বা হাতটা বাড়িয়ে দেয়। ব্যাস্ ঐ পর্য্যন্ত। ওরা চলে গেলে আবার প্রতীক্ষা। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা।

জ্যোতিষির ধৈর্য দেখে আমি হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু তার নিজের কোন ব্যস্ততা নেই। ভাবনা-চিন্তা নেই।

ভ্রমর সিং-এরও অশেষ ধৈর্য। সারা দিন-রাতে গাড়ী চালায় হয়তো বড় জোর চার ঘণ্টা। আর ড্রাইভারের সিটে বসে অপেক্ষা করতে হয় বাকি কুড়ি ঘণ্টা। আমার সব গুলিয়ে যায়। ভাবি, গাড়ী চালাবার জন্য অপেক্ষা করা, না অপেক্ষা করার জন্য গাড়ী চালানো ?

ভাবতে ভাবতেই সময় কাটে। আর সময় কাটতে কাটতেই ঠিক সময়টি এসে হাজির হয়।

আমি ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই। ভ্রমর সিং-এর হাতে ভর দিয়ে স্বয়ং বাজোরিয়া হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে ওঠার মুখেই আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন।

আমার আশা তখন কণ্ঠনালিতে। ফস্ করে যা বলার কথা সাহেবের অবস্থা দেখে ফস্ করেই তা ভুলে গেলাম।

তখন ভ্রমর শিং হ'ল ত্রাণকর্তা। আমার অবস্থা দেখে নিজেই আমার হয়ে প্রার্থনা জানাল। আর রামকিশন বাজোরিয়া কোন কিছু না ভেবেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়ে গাড়ীর সিটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ব্যাস্। মুশকিল আসান। আর ভয় নেই। খোদ্ বাজোরিয়া যখন ঘাড় কাত করেছেন তখন আর কাউকে তোয়াক্কা করি না।

এবার শুধু বেরিয়ে পড়া। সঙ্গে একটা ঝোলা ব্যাগ নাও। কিছু টুকিটাকি জিনিষপত্র নাও। দু-একখানা বই-টই নাও। আর কিছু টাকাকড়ি নাও। তারপর সকাল হলেই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ছুটে চলো হিন্দ্ মোটর।

ঘড়িতে আটটা বেজে গেছে অথচ শিউশংকরবাবুর এখনও পাত্তা নেই। বত্রিশটা আনকোরা এ্যাম্বাসাডার মার্ক টু পূব থেকে পশ্চিমে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো। বিচিত্র বর্ণের গাড়ীগুলোর মসৃণ গায়ে সূর্যের আলো প'ড়ে চোখ ঝলসে দেয়।

কয়েকজন ড্রাইভার টিনের কালো রঙ করা টেমপুরারি রেজি-ষ্ট্রেশন নাম্বার নিয়ে কয়েকটা গাড়ীর সামনে পিছনে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের কোম্পানীর নিজস্ব মেকানিক যতীন মিস্ত্রী সঙ্গে আরও দুজন মিস্ত্রী নিয়ে গাড়ীর যন্ত্রপাতিগুলো শেষ বারের মত পরীক্ষা করে নিচ্ছে। ড্রাইভার প্রায় সকলেই এসে হাজির। হাজির নেই শুধু শিউশংকর মিশ্র।

শিউশংকর এই ট্রিপের হর্তাকর্তা বিধাতা। বত্রিশটা গাড়ীর একটা গাড়ীও এক পাও চলতে পারবে না যতক্ষণ না শিউশংকর বাবু সিগারেটের ধোঁয়া গলায় নিয়ে কাসতে কাসতে অর্ডার দেন, গো অন্!

আর কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বয়স আঠাশ বছর। আর এই কোম্পানীতে শিউশংকরের চাকরীর বয়স ত্রিশ বছরের ওপর। এমন উল্টো-পাল্টা হওয়ার কারণ, কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই শিউশংকর মিশ্র, বাজোরিয়া সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আছে। বলতে গেলে শিউশংকরই, বাজোরিয়াকে এই ট্রান্সপোর্টের ব্যবসায়ে

নামিয়েছে। কাগজে-কলমে কোম্পানীর জন্ম বছর ১৯৪৯ সাল। এর আগেও বছর তিন-চার এ নামে সে নামে কারবার করে ব্যবসার নাড়ীনক্ষত্র জেনে লাভের অঙ্কে পুরোপুরি আস্থা আসতে তবেই পাকাপাকি ভাবে কোমর বেঁধে কোম্পানীর জন্ম দিয়েছে বাজোরিয়া। আর সেই থেকে শিউশংকরই কোম্পানীর সর্বেসর্বা। মালিক বাজোরিয়া শুধু নামেই মালিক। অর্ডার সিকিওর করা থেকে সুরু করে গাড়ী সাপ্লাই দেওয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় কাজের তদারকির ভার এই শিউশংকরের। অথচ সেই শিউশংকরই এখনো বেপাত্তা।

আজ জুন মাসের সাতাশ তারিখ। কাল রাতে রেডিওর আবহাওয়ার পূর্বাভাসে শুনেছি দিনের বেলায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সন্ধ্যের দিকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাপমাত্রার আভাস এখন থেকেই টের পাচ্ছি। রোদের তাপে এরই মধ্যে মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

সকলের থেকে আলাদা হয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকতে খুব বাজে লাগছে আমার। এখানে যে সব ড্রাইভার ঘোরাঘুরি করছে তাদের অনেকেই আমাকে চেনে। দু-বছর ধরে চৌরঙ্গীর অফিস ঘরে আমার টেবিলে গিয়ে এরা কতবার আমার কাছ থেকে বিল পেমেন্ট নিয়েছে। সময়ে অসময়ে সেলাম করেছে। অথচ এখানে কেউই তেমন আমল দিচ্ছে না। যেন ইচ্ছে করেই সরে সরে থাকছে।

মাথায় রোদের ঝাঁজ নিয়ে ড্রাইভারদের সম্বন্ধে আমি উল্‌টো পাল্‌টা ভাবছি। এক একবার খুব রাগ হচ্ছে। ভাবছি, এদের সামান্য ভদ্রতা জ্ঞানও নেই। আমি একা দাঁড়িয়ে আছি দেখেও এরা কেউ আমার কাছে আসছে না। সেলামও করছে না। আবার ভাবছি, আমি কোম্পানীর নিজস্ব লোক। অফিস বাবু। চিফ্ এ্যাকাউন্টেন্ট

এর শ্যালক। কাল অফিসে বাজোরিয়া ভগিনীপতিকে বলেছিলেন, আই মাষ্ট ইনফর্ম মাই ড্রাইভারস্। জানি না কি ইনফর্ম করেছেন। হয়ত সেই জন্যেই কেউ আমার কাছে ঘেঁসছে না।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে জলতেষ্টা পেল। সকালে তাড়া-তাড়িতে বেরুতে গিয়ে ভাত খেয়ে জল খাই নি। মুখের ভেতরটা আঠা আঠা লাগছে।

উত্তর দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে সামনেই একটা চায়ের দোকানে গিয়ে এক গ্লাস জল চাইতেই ব্যানার্জীর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল।

সন্তোষ ব্যানার্জী আমাদের কোম্পানীর নিজস্ব ড্রাইভার। আমায় দেখে ঠোঁট থেকে চারমিনার সিগারেটটা নামিয়ে তাড়াতাড়ি হাতের মধ্যে চেপে ধরে দোকানের ভেতরে কাঠের বেঞ্চ ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। তারপর খুব লজ্জা পেয়ে বলল, আপনি সংগে কোন জলের জায়গা নেন নি বুঝি?

আমি জল খেয়ে দোকানদারকে হিণ্ডেলিয়ামের গ্লাসটা ফেরৎ দিয়ে বললাম, তাড়াতাড়িতে সবকিছু গুছিয়ে নেওয়া হয় নি।

ব্যানার্জী দোকান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, বড্ড রোদ্দুর। তাই দোকানের ভেতরটায় বসেছিলাম। আপনি চলুন না বসবেন।

আমি হাতঘড়ির দিকে একবার দেখে নিয়ে বললাম, না। আর বসবো না। সাড়ে আটটা প্রায় বাজে।

এই সময়ে পিছনে গাড়ীর হর্ণ শুনে সরে দাঁড়াতেই শিউশঙ্কর বাবুকে দেখতে পেলাম।

বাজোরিয়ার কালো অষ্টিন্ থেকে নেমেই শিউশংকরবাবু আমায় দেখতে পেলেন।

আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম।

প্রতিনমস্কার জানিয়ে শিউশংকরবাবু মুখটিপে হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, এবার বত্রিশ খানা গাড়ীর দায়িত্বের সঙ্গে আপনার

দায়িত্বটাও ঘাড়ে চাপালেন।

আমিও রসিকতা করে বললাম, ভয় পাচ্ছেন কেন? দায়িত্বগুলো না হয় ভাগাভাগি করেই নেওয়া যাবে।

সিগারেটে টান দিয়ে ফ্যাক্টরীর দিকে এগোতে এগোতে শিউশঙ্কর বাবু বললেন, কি রকম?

আমি বললাম, আপনি আমার দায়িত্ব নিলে আমি গাড়ীগুলোর দায়িত্ব নিতে রাজী আছি।

শিউশঙ্করবাবু কাসতে কাসতে কি একটা বললেন। ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বাজোরিয়ার অষ্টিনের ড্রাইভার জানকী প্রসাদ শিং অনেক-গুলো মোট-ঘাট নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নতুন গাড়ীগুলোর একটার ভেতরে সব গুছোতে লাগল।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে চারিদিক থেকে একটা গরম বাষ্প উঠে গোটা জায়গাটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। শিউশংকরবাবুর হাঁপানির ধাত। গরম সহ্য করতে পারেন না। সারা শরীর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘামে ভর্তি হয়ে গেল।

ব্যানার্জী কোথাথেকে একটা ছাতা নিয়ে শিউশংকরবাবুর মাথায় ধরল।

শিউশংকরবাবু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ব্যানার্জীর দিকে তাকিয়ে বললেন, জানকী কো বোলাও। দাসবাবু তুমারা গাড়ীমে যায়েগা। তুম চাল্লিশ পাঁচপন মে চলা যাও।

ব্যানার্জী যন্ত্রচালিতের মত জানকীপ্রসাদের হাতে ছাতা এগিয়ে দিয়ে গাড়ীর আড়ালে মিশে গেল।

ঠিক পৌনে ন'টায় গাড়ী স্টার্ট দিল। মাত্র পনের মিনিট সময়ের মধ্যে সিগারেট টেনে কাসতে কাসতে শিউশংকরবাবু

ম্যাজিকের মত একরাশ কাজ করে ফেললেন। ড্রাইভার লিষ্টের সঙ্গে গাড়ীর নাম্বার মিলিয়ে বত্রিশটা গাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম মিটিয়ে তিনি যেই গাড়ী ছাড়বার অর্ডার দিলেন অমনি বত্রিশটা ইঞ্জিন একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। তারপর এক এক করে প্রতিটি গাড়ী উত্তরের গেট দিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল।

আমি শিউশংকরবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ী ছাড়া দেখছি। একসময় চাল্লিশ পাঁচপন গাড়ী নিয়ে ব্যানার্জী এসে সামনে দাঁড়াল।

শিউশংকর মিশ্র গাড়ীর পিছনের হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে বললেন, উঠিয়ে।

আমি বললাম, আপনি!

মিশ্রজী বললেন, আমার অন্য গাড়ী।

ইতিমধ্যে ব্যানার্জী নেমে এসে আমার কাঁধ থেকে ঝোলাটা চাইল।

আমি ইতস্ততঃ করতেই শিউশংকর বাবু বললেন, লেট হিম ডু! ইট ইজ দেয়ার ডিউটি।

আমি ঝোলাটা এগিয়ে দিলাম।

ব্যানার্জী সেটা পেছনের সিটে রেখে ড্রাইভারের জায়গায় গিয়ে বসল।

এই মুহূর্তে নিজেকে একজন কেউকেটা বলে মনে হ'ল আমার। চেষ্টা করেও আত্ম-অহংকার চাপতে পারলাম না। কত মানী-গুণী মানুষকে আমি গাড়ীতে চাপতে দেখেছি। তাদের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সরকারী অফিসের বড় সাহেব, মার্চেন্ট ফার্মের ডিরেক্টর, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, রাজনৈতিক নেতা, ফিল্মষ্টার আরো কত। আমার চোখের সামনে শিউশংকর বাবুর গাড়ীর হাতল ধরা মূর্তি ইঠাৎ সত্যজিৎ রায়ের ছবির মতো ফ্রিজ হয়ে গেল। তখন নিজেকেই নিজে সম্মান করতে ইচ্ছে হ'ল। একটু আগে আমার প্রতি ড্রাইভারদের উপেক্ষা নিয়ে নিজেকে

ছোট ভাবছিলাম। এখন সেই ড্রাইভারদের হর্তা-কর্তা বিধাতা স্বয়ং শিউশংকর মিশ্র গাড়ীর দরজা খুলে আমায় আহ্বান করছেন। আমি যতটা অবাক হলাম তার চেয়েও বেশী নিজেকে ধন্য মনে করে খুব গর্বভরে চারিদিকে একবার তাকালাম। এখনও পনেরটা গাড়ী ষ্টার্ট নিয়েও ছুটতে পারছে না। শিউশংকর বাবুর অর্ডার না পেলে কেউ ছুটতে পারবে না। আর শিউশংকরবাবুও আমাকে গাড়ীতে না বসিয়ে গাড়ী ছাড়ার অর্ডার দিতে পারছেন না।

খুব সহজ ভাবে ঘাড়টা ঈষৎ শিউশংকর মিশ্রের দিকে হেলিয়ে ধন্যবাদ জানানোর ভঙ্গিতে আমি গাড়ীতে উঠলাম। ভারতের বৃহত্তম মোটর গাড়ী কোম্পানীর তৈরী মার্ক টু এ্যামবাসাডারের আনকোরা গদী আমার স্পর্শ পেয়ে কেঁপে উঠে সামান্য নেমে গেল।

শিউশংকর মিশ্র আদেশের ভঙ্গিতে ব্যানার্জীর সিটের কাছে মাথা নিচু করে বললেন, শেঠজীকা অর্ডার, বহুত হুঁশিয়ার সে চল্‌না। বাবুজীকো কুছ্ তগলীব্ হোগা তো নোকরি রাখনা মুশকিল হোগা। এ বাত খেয়াল রাখনা।

• ব্যানার্জী নিতান্ত বিনীত ভাবে উত্তর দিল, যো আপকা হুকুম সাব।

গাড়ী হুস করে উত্তরের গেট পেরিয়ে জি. টি. রোডের দিকে এগিয়ে চলল। আর আমি, জীবনে প্রথম একা একটা গাড়ীর প্রায় ষোল আনা অধিকার করার দুর্লভ সৌভাগ্যে যেন একান্ত অভ্যস্থ ভঙ্গিতে পিছনে হেলান দিয়ে বসলাম।

আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিক মিস্টার বাজোরিয়ার পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস রাজস্থানে। কিন্তু বাজোরিয়ার নিজের জন্ম হয়েছিল রেঙ্গুনে। তখন ১৯১৫ সাল। বাজোরিয়ার বাবা

রামনন্দনের বয়স তখন আঠাশ বছর। ছেলেবেলা থেকেই ঘরে মন টেঁকে না রামনন্দনের। ফাঁক পেলেই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। বাবা একজন ছোটোখাটো জমিদার। কয়েকশো বিঘে জমি তার। বড় বড় কয়েকটা খামার। দু-দুটো রাইস মিল। সব মিলিয়ে ঘরে অর্থের প্রাচুর্য। কিন্তু রামনন্দনের মতলব অন্য। চাষবাস খামার এসবে তার মন নেই। তার কেবল দেশ-বিদেশ বেড়াবার ইচ্ছা। আরও দুজন ভাই আছে। রামনন্দন বড়। অথচ তার উড়ো মন দেখে বাবা-মা ভয় পেয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে দিল। ফল উল্‌টো হ'ল। রামনন্দন আরও বেঁকে বসল। একদিন রাতে চুপি চুপি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবার মুখে নতুন বউ পথ আটকে দাঁড়াল। রামনন্দনও নাছোড়বান্দা। অবশেষে রফা হ'ল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঘর ছাড়ল। সংগে নিল বেশ কিছু অর্থ আর বিয়ের সময় পাওনা গয়নাগাঁটি।

বউকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে রামনন্দন একদিন রেঙ্গুনে এসে হাজির হ'ল। তখন নতুন বউ পুরোনো হয়ে গেছে। স্বামীর বেড়ানোর নেশা তাকেও পেয়ে বসেছে। কিন্তু রেঙ্গুনে এসে দুজনেই আটকা পড়ে গেল। সন্তানসম্ভবা বউকে নিয়ে আর ছোটাছুটি করতে সাহস হ'ল না রামনন্দনের। অবশেষে রেঙ্গুনেই মাস তিনেক পর একদিন গভীর রাতে রামকিশন বাজোরিয়ার জন্ম হ'ল।

ছেলেকে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব খুশী। কিন্তু এতটুকু ছেলে সঙ্গে নিয়ে আর বেড়ানো চলে না। অগত্যা সংসার।

সংসার হলেই ঘর চাই। এতদিন পর রাজস্থানের বাড়ীর দিকে মন টানল রামনন্দনের। একবার ভাবল এবার নিজের দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু অনেকদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে বাড়ীর কোন খোঁজ-খবরই রাখে নি। তাই হঠাৎ বাড়ী ফিরতে কেমন বাধো বাধো ঠেকলো। অবশেষে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেশের ঠিকানায় বাবার নামে রামনন্দন একটা পত্র ছাড়ল।

প্রায় একমাস পর পত্রের উত্তর এল। ছ-মাস আগে আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার বাবা-মা দুজনেই মারা গেছে। আর রামনন্দনের অনুপস্থিতিতে বাকি দু-ভাই পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি দু-ভাগে ভাগ করে নিয়েছে।

এতোদিনে রামনন্দনের বেড়ানোর নেশা বন্ধ হ'ল। স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে রেঙ্গুনেই ছোট একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে পাকা-পাকি ভাবে সংসার পাতল সে।

কিন্তু সংসার পাতলেই হ'ল না। সংসার চালাবার জন্য চাই অর্থ। আর অর্থের জন্য চাই উপার্জন। রামনন্দনের শিক্ষাগত যোগ্যতা অল্প। তাছাড়া রেঙ্গুণ তার কাছে বিদেশ। তাই চেষ্টা করেও কোন কাজ জুটিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

সেই সময় রেঙ্গুনে এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা নিতান্তই অভাবী। কলকারখানায় দিন মজুরের কাজ করে কোন রকমে তারা জীবন কাটাতো। রামনন্দনের হাতে তখনও কিছু টাকা আছে। সুযোগ বুঝে সেই টাকা থেকে কিছু কিছু ধার দিতে সুরু করল সে। পরিবর্তে কিছু বাড়তি উপায় হতে থাকল তার।

এদিকে রামকিশনের বয়স বাড়তে লাগল। এক···চার···দশ···পনের···পঁচিশ। এল ১৯৪০ সাল। সারা পৃথিবী জুড়ে সুরু হ'ল যুদ্ধ। রেঙ্গুনের বাজার ফুলে উঠল। রামনন্দন এখন রেজিষ্টার্ড মানি-লেণ্ডার। রেঙ্গুন শহর জুড়ে তার ঢালাও সুদের কারবার। বাড়ী, গাড়ী, অর্থ, প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব নেই। অভাব শুধু ছেলে-মেয়ের। রামকিশন তার একমাত্র সন্তান। যুদ্ধের বাজারে রাম-নন্দনের ব্যবসা ক্রমশঃই ফেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু বাধ সাধল জাপান। আকাশ থেকে সে হঠাৎ বোমা বৃষ্টি সুরু করল। ভয় পেয়ে তখন অনেকেই রেঙ্গুন ছেড়ে পালাতে সুরু করল। রাম-নন্দন বিপাকে পড়ল। তার স্ত্রী রেঙ্গুন ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু রামনন্দনের পক্ষে রেঙ্গুন ছেড়ে যাওয়া তখন একরকম অসম্ভব।

হাজার হাজার টাকা তার বাজারে ছড়ানো। একবার রেঙ্গুন ছাড়লে সে টাকা পাবার আর কোন আশাই থাকবে না। এদিকে প্রাণের ভয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তার স্ত্রী রেঙ্গুন ছাড়ার জন্য অস্থির। অগত্যা নিরুপায় রামনন্দন একদল বাঙালী পরিবারের সঙ্গে স্ত্রী আর একমাত্র সন্তানকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে রেঙ্গুনেই রয়ে গেল।

সেই প্রথম রামকিশন বাজোরিয়া কলকাতা দেখল। রেঙ্গুনের বোটাটং অঞ্চলের মিস্ত্রী পল্লীতে জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়ে কলকাতার আলো ঝলমল শহরে তার নেশা ধরে গেল। রামনন্দনের স্ত্রী প্রমাদ গনলেন। তার মনে পড়ল স্বামীর কথা। এই বয়সেই রামনন্দন রাজস্থানের ঘর ছেড়ে স্ত্রীর হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়েছিল। আর আজ সেই বয়সেই রামকিশন রেঙ্গুনের ঘর ছেড়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বয়সে সে নবীন। চোখে তার রঙীন স্বপ্ন। পকেটে তার বাবার সুদে খাটানো অপর্যাপ্ত বেহিসেবি অর্থ।

এদিকে পৃথিবীময় যুদ্ধ শেষ হ'ল। আর ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধ সুরু হ'ল। কলকাতা সেই যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। সেই খবর পেয়ে রামনন্দন চিঠির পর চিঠি পাঠিয়ে স্ত্রী আর ছেলেকে রেঙ্গুনে ফিরে যেতে বলল। কিন্তু রামকিশন সে কথা কানেই তুলল না। সে তখন শিউশংকর মিশ্রের ছোট অষ্টিনে চেপে সারা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে।

শিউশংকর মিশ্রের বয়স তখন ছত্রিশ ছুঁই ছুঁই। তার আসল বাড়ী বিহারের মজঃফরপুর জেলা। সেখানে সে বড় একটা থাকে

না। কলকাতাতে বছর পাঁচ ছয় একটা ব্যবসা করছে। গাড়ী কেনা-বেচার ব্যবসা। পুরানো মোটর গাড়ী মেরামত করে নতুন রঙ করে বিক্রি করা। ভালই চলছে ব্যবসা। আয় মন্দ হচ্ছে না। কিন্তু বিহারের এক মধ্যবিত্ত ঘরের চাষীর ছেলে শিউশংকরের মূল-ধনের যথেষ্ট অভাব। কোনরকমে অনেক কষ্টে বাবাকে জোর করে রাজী করিয়ে দেশের কিছু জমি বিক্রি করে সে ব্যবসায় নেমেছে। এখন এ ব্যবসাকে ভালভাবে দাঁড় করাতে গেলে দরকার কিছু অর্থের। আর সেই অর্থের আশাতেই রামকিশন বাজোরিয়াকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ভাড়া করা অষ্টিনে চাপিয়ে গোটা কলকাতা সে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে।

রামকিশনের সঙ্গে কথায় কথায় শিউশংকর বুঝেছে, অদূর ভবিষ্যতে রামকিশন প্রচুর অর্থের অধিকারী হবে। কিন্তু সে অর্থ রক্ষা করা কিংবা তার পরিমাণ বাড়ানো কোনোটাই রামকিশন পারবে না। বাবা-মার একমাত্র সন্তান রামকিশন বাজোরিয়া শুধু খরচ করতেই শিখেছে সঞ্চয়ের শিক্ষা সে পায় নি। তাই কোনরকমে যদি রামকিশনকে এই গাড়ীর ব্যবসায়ে নামানো যায় তাহলে একটা মোটা অঙ্কের টাকা সে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতে পারবে।

পাকা খেলোয়াড়ের মত রামকিশনকে নিয়ে খেলতে খেলতে শিউশঙ্কর তাকে একদিন বাসুদেব আগরওয়ালার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করল।

বাসুদেব আগরওয়ালা মোটর গাড়ীর হোলশেল এজেন্ট। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তার কোম্পানীর অনেকগুলো শাখা আছে। এক শাখা থেকে আর এক শাখায় গাড়ী ডেলিভারী দেবার জন্য সে একজন ঝানু ঠিকাদারের খোঁজ করছিল। শিউশঙ্কর খবর পেয়ে রামকিশনকে নিয়ে আগরওয়ালার সংগে দেখা করল।

চৌরঙ্গী রোডের ওপরেই আগরওয়ালা মোটর কোম্পানীর চমকলাগানো শো-রুম। একেবারে বিলেতী কায়দায় মসৃণ কাঁচের

দরজার ভেতর একখানা নিউমডেলের চকচকে ল্যাণ্ডমাষ্টার খুব মন্থর গতিতে ক্রমাগত ঘুরে চলেছে। চারদিক থেকে অজস্র নিয়ন বাতির উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-এর আলো গাড়ীর গায়ে প'ড়ে চতুর্দিকে ঠিক্‌রে পড়ছে।

রামকিশন গোল কাঠের চেয়ারে ব'সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘুরন্ত গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল। একটু তফাতেই ছোট্ট কয়েকধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে দোতলায় নিজের চেম্বারে বসে শিউশঙ্করের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত গোপণ কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে বাসুদেব বার বার শো-রুমের চেয়ারে বসা রামকিশনকে লক্ষ্য করছিল।

শিউশঙ্কর বোঝাচ্ছিল, রাজস্থানের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েও রামকিশনের বাবার পয়সায় ছ্যাদলা পড়ে যাচ্ছে। রেঙ্গুনে তার নিজের বিরাট সম্পত্তি। তাছাড়া ছেলে হিসাবে রামকিশনের তুলনা হয় না। যেমনি ভদ্র তেমনি বিশ্বাসী। সব কাজেই সে পাকাপোক্ত। মাত্র তিন দিনের মধ্যে শিউশংকরের ছোট অফিসে সে গাড়ী চালাতে শিখেছে। মাত্র সাত দিনের মধ্যে সে গাড়ীর যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে। কলকাতার ব্যাংকে তার নিজের নামে একটা মোটা টাকার পরিমাণ জমা রয়েছে।

শিউশংকর বলে যাচ্ছিল আর বাসুদেব আগড়ওয়ালা এক এক করে মিলিয়ে নিচ্ছিল। বিরাট সম্পত্তি, প্রচুর অর্থ, ভদ্র, বিশ্বাসী, কর্মপটু। এর সঙ্গে বাসুদেব নিজে যোগ করল হ্যাণ্ডস্যাম। হ্যাঁ। হ্যাণ্ডস্যামই বটে। ছিপছিপে চেহারায় সুন্দর মুখশ্রী রামকিশনের। মখমলের মতো কালো মাথা ভর্তি চুল।

অবশেষে রামকিশনের ডাক পড়ল। হাতে-কলমে কোন পরীক্ষাই তাকে দিতে হ'ল না। কাগজে-কলমে কোন প্রমানই তাকে দেখাতে হ'ল না। শিউশংকর মিশ্রকে সাক্ষী করে রামকিশন বাজোরিয়া সেদিন থেকেই আগরওয়ালা মোটর কোম্পানীর পয়লা

নম্বর ঠিকাদারের পদটি একরকম অতি সহজেই অধিকার করে নিল।

ওদিকে স্ত্রীর চিঠি পেয়ে রামনন্দন বাজোরিয়ার মাথায় রেঙ্গুনের আকাশ ভেঙে পড়ল। তার পঁচিশ বছরের এমন ব্যবসা ছেড়ে রামকিশন কেন যে সামান্য একটা মোটর কোম্পানীর ঠিকাদার হ'তে গেল রামনন্দন তা ভেবেই পেল না।

গাড়ী বালি রোড পার হয়ে আন্দুল রোডে এসে পড়ল। রাস্তার দিকে চোখ রেখে মাপা গতিতে ব্যানার্জী খুব শান্তভাবে গাড়ী চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার অভ্যস্ত হাতে গিয়ার চেঞ্জিংএর কায়দা দেখে বোঝা যাচ্ছে এ কাজে সে অভিজ্ঞ। আমি মাইল-এজ দেখলাম। মাত্র ছ মাইল। ঘড়িতে দেখলাম ন'টা কুড়ি। হিসেব করলাম ঠিক আঠার মিনিট লাগল। তাহলে গাড়ীর গতি হ'ল ঘণ্টায় বিশ মাইল। কিছুই নয়। এক একটা রেসিং সাইকেল নিয়ে ইচ্ছে করলে ঘণ্টায় পনের কুড়ি মাইল অনায়াসে পার হওয়া যায়।

আমার পাশ কাটিয়ে হুশ হুশ ক'রে অনেক বাস, লরি এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে। আমি লজ্জা পেলুম। যাত্রী নিয়ে পাবলিক বাস এই গতিতে গেলে আমরা প্রায়ই চালককে গালমন্দ করি। তখন ভাবি নিজের গাড়ী না থাকলে এ বাজারে আর ক'রে খেতে হবে না। পাঁচ মিনিটের পথ পনের মিনিট লাগালে চাকরীই হোক আর ব্যবসাই হোক সব কিছুই লাটে উঠবে। অথচ এখন প্রাইভেট গাড়ীতে চড়েও আমি

বাসের পিছন পিছন যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে হ'ল ব্যানার্জী গাড়ীটাকে আরও একটু জোরে চালাক। কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না।

পরের গাড়ীতে চেপে অর্ডার দেওয়া ভাল দেখায় না। আমি ঘুরিয়ে ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করলাম, এ গাড়ীতে সাধারণতঃ কত মাইল স্পীড তোলা যায়?

গাড়ী একেবারে মন্থর করে একটা গর্ত্ত বাঁচিয়ে ব্যানার্জী বলল, ইচ্ছে করলে আশি-নব্বই মাইল তোলা যায়। কিন্তু আমরা তা করি না।

—কেন?

—আমাদের স্পীড ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল বাঁধা। এটাই নিয়ম।

—তোমরা কি কখনও নিয়ম ভাঙো না?

—ভাঙি। কেবলমাত্র বিপদ-আপদ এড়াবার জন্য।

বিপদের কথা শুনে আমার ভগ্নিপতির কথা মনে পড়ল। আসবার সময় তিনি বলেছিলেন, রাস্তা-ঘাটে অনেক রকমের বিপদ-আপদ আছে। আমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ভাবলাম সত্যিই যদি কোন বিপদ হয়। মনে মনে ঠাকুরের নাম করে চুপ করে গেলাম। ব্যানার্জীকে আর বিপদের কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না।

গাড়ী বোম্বে রোড ধরে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে। এ রাস্তা আমার পরিচিত। স্কুলে পড়তে পড়তে একবার বাড়ী থেকে পালিয়ে এ রাস্তা ধ'রেই সাইকেলে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। তখন সবেমাত্র সাইকেল চড়তে শিখেছি। নতুন চালকের ষোল আনা উদ্যম বুকে নিয়ে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টায় খড়্গাপুর পৌঁছেই বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দেখা হয়ে গেল। আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনে পিঠ চাপড়ে তিনি আমাদের তিনজন বন্ধুর কান ধরে তিনবার মোচড় দিয়ে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে পুব মুখো ক'রে দিলেন। সমস্ত উদ্যম হারিয়ে কি কুক্ষণে বাবার বন্ধুর সঙ্গে

দেখা হ'ল ভাবতে ভাবতে মাত্র আট ঘণ্টায় সেদিন খড়্গপুর থেকে হাওড়ায় এসে পোঁছে ছিলাম।

এই সেই পথ। মাত্র কয়েক বছর আগে এ পথের জন্ম। তখন কত বাড়ী-ঘর ভেঙে-চুরে অজস্র গাছপালা কেটে কত না চাষের জমি নষ্ট করে তৈরী হ'ল কলকাতা বোম্বাই জাতীয় সড়ক। প্রথম অবস্থায় কত ওজোর-আপত্তি। কত ঝগড়া-ঝাটি, অনুরোধ-উপরোধ বাধা-বিপত্তি। কোথাও আরও বাড়াবাড়ি। সেখানে গাড়ী ভর্তি পুলিশ এসেছে। রাত্তিরে হ্যাজাকের আলো জ্বেলে ঠিকাদার বাঁধা সময়ে কাজ শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

আজ আর কোন আপত্তি নেই। জাতীয় সড়ক এখন গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষদের মুখে মুখে এখন বোম্বে রোডের নাম। এখন শিবতলার পূজোর মিটিং হবে কোথায় না বোম্বে রোডের ধারে। জগৎপুর স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে গেট তৈরী হবে কোথায় না বোম্বে রোডের ধারে। বঙ্কু গয়লার কালো গরুটা বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখো হয়ত বোম্বে রোডের ধারে চ'রে বেড়াচ্ছে। বিকেল হলেই দলে দলে মেয়ে, ,পুরুষ বোম্বে রোডের ধারে হাওয়া খেতে আসে। গ্রীষ্মকালের অর্ধেক রাত পর্য্যন্ত বোম্বে রোডের মাঝে মাঝে ছোট বড় পুলের সিমেণ্টের বেদীর ওপর লাইন দিয়ে শুয়ে ব'সে গল্প করে কত না গ্রামের লোক।

মাঝে মধ্যে আবার এর ব্যতিক্রমও হয়। একদিন নগেন মোড়লের বড় ছেলে রাতে কাজ ক'রে মিল থেকে ঘরে ফেরার পথে সাইকেল শুদ্ধু লুটিয়ে পড়ল এই বোম্বে রোডের ওপর। চোখের নিমেষে ট্রান্সপোর্টের লরীর চাকার তলায় তার মাথাটা গুঁড়িয়ে গেল। সেবার অগ্রহায়ণের শেষ লগ্নে উলুবেড়ে থেকে বরযাত্রীর দল নিমন্ত্রণ খেয়ে কলকাতায় ফেরার পথে যাত্রীশুদ্ধ বাস গড়িয়ে পড়ল এই বোম্বে রোডেরই ধারে মস্ত এক পুকুরে। তখন চিৎকার, ছুটোছুটি,

কান্নাকাটি। দমকল। এ্যাম্বুলেন্স। তখন কিছুদিন বোম্বে রোড মড়ার মত অন্ধকার নির্জনে একা একা পড়ে থাকে। গ্রামের লোক-জন অভিমানে কেউ আর রাস্তায় আসতে চায় না। তখন বোম্বে রোডের মুক্ত বাতাস নগেন মোড়লের দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠে।

দিন যায়। শত শত গাড়ীর চাকার তলা নগেন মোড়লের বড় ছেলের রক্তের দাগ নিয়ে দূরে দূরে চলে যায়। গ্রামের মানুষ ফিরে আসে। এই বোম্বে রোডের ধারেই তৈরী করে সুদৃশ্য সমাধি মন্দির। চাঁদা তুলে শ্বেত পাথরের ফলক তৈরী হয়। বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়—"পথের বলি"।

একটা পেট্রোল পাম্পে এসে গাড়ী থামল। আমার আগে আরও ষোলটা গাড়ী রাস্তার ধার ঘেঁসে পর পর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যানার্জী গাড়ী নিয়ে লাইনে দাঁড়াল। তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আমাকে নামতে বলল।

আমি তাড়াতাড়ি ডান দিকের দরজা খুলে নামতে যাব ব্যানার্জী বাধা দিল। নিজে এসে বাম দিকের দরজা খুলে বলল, এদিক দিয়ে নামুন। আমরা কখনও পেছনের সিটের ডান দিকের দরজা খুলে কাউকে নামাই না। এটা অনিয়ম। এ্যাক্সিডেণ্ট্ হতে পারে।

আবার নিয়ম। আবার এ্যাক্সিডেণ্ট্। একটু আগে বিপদের কথা শুনে আমি ভয় পেয়েছি। এখন ব্যানার্জী আবার এাক্সিডেণ্টের কথা তুলছে। মনে মনে ভাবলুম, ব্যানার্জী তো আচ্ছা বোকা। রাস্তায় বেরিয়ে এসব অলুক্ষণে কথা কি না বললেই নয়।

গাড়ী থেকে নেমে পেট্রোল পাম্পের সীমানার ভেতর ঢুকতে ঢুকতেই আরও পাঁচ-ছখানা গাড়ী এসে লাইনে দাঁড়াল।

চলতে চলতে ব্যানার্জী বলল, কিছু মনে করেন নি তো?

আমি বললাম, কিসের?

—ঐ যে আপনাকে ডান দিকের দরজা খুলতে বারন করলাম ব'লে।

—না না, মনে করব কেন ? নিয়ম মানতে হবে বৈকি।

—আমারও সেই মত। নিয়ম মানতেই হবে। বিশেষ ক'রে এই কনভয়ে। এখানে ডবল দায়িত্ব। এক নিজের, দুই গাড়ীর। দুটোই দামী। নিজের জীবন গেলে সংসার ভেসে যাবে। আর গাড়ী গেলে আমিই ভেসে যাব।

—কিন্তু রাস্তাঘাটে যে কোন মুহূর্তে গাড়ীর ক্ষতি হতে পারে। গাড়ী একটা যন্ত্র। আর যন্ত্র বিকল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে ড্রাইভার কি করতে পারে ?

—গাড়ী যন্ত্র বলেই তো সবসময় তাকে কণ্ট্রোলে রেখে চালাতে হয়। আর যাতে গাড়ী কণ্ট্রোলে চলে তার জন্যেই যত নিয়ম।

—তাহলে এত যে গাড়ী এ্যাক্সিডেণ্ট হয় সে সবই কি ড্রাইভারের দোষে ?

—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই। ড্রাইভার সতর্ক থাকলে এ্যাক্সিডেণ্ট এড়ানো যায়।

—তুমি কখনও এ্যাক্সিডেণ্ট করো নি ?

—একবার।

ব্যানার্জী বোধহয় গল্পটা বলতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে শিউ-শংকর বাবুর গলা শুনে চুপ করে গেল।

মিশ্রজীর গাড়ী আমাদের পেরিয়ে পাম্পের ভেতর ঢুকে গেল।

শিউশংকরবাবুর গাড়ীর ড্রাইভার চরণ সিং একটা খাটিয়ায় মোটা সতরঞ্চ পেতে দিল। মিশ্রজী গাড়ী থেকে নেমে খাটিয়ায় বেশ জাঁকিয়ে বসলেন।

পাম্পের ভেতর একটা চায়ের দোকান। ড্রাভভাররা সেখানে গিয়ে ভিড় করেছে। বছর তেরো চোদ্দ বয়সের একটা হিন্দুস্থানী ছেলে মোটা কাঁচের গ্লাশে ঘন দুধের চা নিয়ে হাতে হাতে বিলি করছে।

আমি কোন্ দিকে যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শিউশংকর বাবুকে

পাশ কাটিয়ে বোম্বে রোডের দিকেই এগোচ্ছিলাম এমন সময় মিশ্রজী ডাকলেন, আইয়ে দাসবাবু। বৈঠিয়ে।

মিশ্রজীর খাটে ব'সে ড্রাইভারদের লক্ষ্য করলাম। বত্রিশ জন ড্রাইভার। এদের কয়েকজন আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর নিজস্ব। তাদের আমি চিনি। গুনে দেখলাম দশ জন। বাকি বাইশ জন আমার অচেনা।

এতক্ষণে ড্রাইভাররা চা খাওয়া শেষ করে শিউশংকর বাবুর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। মিশ্রজী আমার হাতে একটা নামের লিষ্ট দিয়ে এক এক ক'রে ডাকতে ব'লে একটা এ্যাটাচি খুলে একগোছা দশ টাকার নোট বার করলেন।

আমি কাগজটা দেখলাম। আমাদের কোম্পানীর টাইপিষ্ট কানাইবাবুর নির্ভুল টাইপ করা বত্রিশ জন ড্রাইভারের নামের লিষ্ট। মনে পড়ল কানাই বাবুকে। বেচারীর সত্যই দুর্ভাগ্য। চোদ্দ বছর ধরে পাতার পর পাতা এমন সুন্দর টাইপ করেও কোম্পানীর কাছে বছরে পাঁচ টাকা ইনক্রিমেন্টেরও একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা আদায় করতে পারল না। ক'টা টাকাই বা মাইনে পায়। অথচ বাড়ীতে নিজের সংসার।

মিশ্রজী টাকা গুনছেন। আর আমি ড্রাইভারের নামগুলো মুখস্থ করছি। ভ্রমর সিং, ট্রিনা মাহাতো, এন. এস. পিঙ্গল, সার্দুল সিং, সন্তোষ ব্যানার্জী, হানিফ মহম্মদ, চরণ সিং, মুক্তি ঝা, রামকুমার পাণ্ডে, রবার্ট উইলশন, যতিন দাস, সাত্তার, সূরজন সিং, নন্দলাল, মহম্মদ আলি......

এক ঘণ্টারও বেশী সময় চলে গেল। বত্রিশ জন ড্রাইভারের মাথাপিছু পঁচিশ টাকা করে হাত খরচ দিয়ে শিউশংকর মিশ্র খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পাম্পের ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা পড়ল। গাড়ীগুলো এক এক করে পাম্পে ঢুকে তিন লিটার করে পেট্রোল নিয়ে আবার বোম্বে

রোডে এসে উঠল। এবার গাড়ীর জায়গা কিছু অদল বদল হ'ল। ব্যানার্জীর মতে এতক্ষণ অনিয়ম চলছিল। কনভয়ের নিয়ম হ'ল, প্রথম গাড়ী হবে লিডিংকার। পরের গাড়ী ইনচার্জের। তারপর অন্যান্য গাড়ী। একেবারে শেষে থাকবে ব্রেক-ডাউন কার। তাতে থাকবে মেকানিক্। কিন্তু এতক্ষণ মিশ্রজী শেষের গাড়ীতে ছিলেন। আর মেকানিক্ যতিন মিস্ত্রী ছিল লিডিং গাড়ীতে।

এবার নন্দলাল হ'ল লিডিং মাষ্টার। এক সঙ্গে তিন চারটে পান মুখে পুরে মিশ্রজীর দেশের লোক নন্দলাল গাড়ী নিয়ে সবার আগে গিয়ে দাঁড়াল। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, ধবধবে ফর্সা নন্দলাল যেন বাঘের বাচ্ছা বাঘ। বাবা রামাশিষ পাণ্ডে বিহারের মজঃফরপুর জেলার সেরা ড্রাইভার ছিল। ড্রাইভিং-এ নন্দলালের হাতেখড়ি হয়েছিল বাবার কাছেই। সে আজ বহুদিন আগেকার কথা। বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ তখন বাড়ীর বাইরে বেরুতে সাহস পায় না। রামাশিষ পাণ্ডে তখন এগারো বছরের বালক নন্দলালকে নির্জন রাস্তায় গাড়ী চালাতে শিখিয়েছে। সেই বয়সেই নন্দলালের তেজী ঘোড়ার মত বাড়ন্ত গড়ন দেখে লাইসেন্স ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু তাকে টেম্পুরারি একটা লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাবাকে পাশে বসিয়ে সেই বয়সেই নন্দলাল সত্তর মাইল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে রামাশিষকে অবাক ক'রে দিয়েছিল।

শিউশংকর মিশ্র একজন ঝানু ইন্চার্জ। গাড়ী আর ড্রাইভার চিনতে তাঁর কোনদিন ভুল হয় না। ওপর থেকে এক নজরে দেখেই ঠিক ধরে নেন কেমন হবে। নন্দলালকে তিনি বিশ বছর দেখছেন। কতবার কত জায়গায় কনভয়ের লিডিং মাষ্টার করেছেন তাকে। নন্দলালও তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করে। সে জানে লিডিংকার চালাতে গেলে রাস্তা-ঘাট জলের মত মুখস্থ রাখতে হয়। কোন্ রাস্তা কোথায় সুরু হয়েছে আর কোথায়

শেষ হয়েছে, কোথায় যেতে কতক্ষণ সময় লাগে, রাস্তার অবস্থা কেমন, কোথায় কোথায় বিপদের আশঙ্কা আছে, এসব নন্দলাল গড় গড় করে বলে যেতে পারে।

মিশ্রজী ইন্‌চার্জ। চরণ সিং তার গাড়ী নিয়ে নন্দলালের পিছনে লাগাল। যতিন মিস্ত্রী রইল শেষের গাড়ীতে। মেকানিক্ হলেও সে নিজের গাড়ী নিজেই ড্রাইভ্ করবে। অবশ্য একসঙ্গে ড্রাইভার আর মেকানিক্ ছুটো পদের জন্য সে আলাদা আলাদা পারিশ্রমিক পাবে।

গাড়ী আবার চলতে স্থরু করল। এবার গতিবেগ একটু বাড়ল। ব্যানার্জী বলল, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঘড়িতে সাতটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। আমরা বারোঘোড়া এসে পৌঁছলাম। বারোঘোড়া— বাংলা আর বিহারের বর্ডার। আজ রাতে এখানেই আমাদের হল্টেজ্।

ব্যানার্জী গাড়ী নিয়ে একটা স্কুলের সামনের মাঠে পার্ক করল। আমি বিহারের মাটিতে পা দিলাম।

গাড়ী ছেড়ে ড্রাইভাররা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ পাশাপাশি কয়েকটা হোটেলের খাটিয়ায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সব হোটেলই এখানকার মুক্তাঙ্গন। সামান্য একফালি জায়গার মাথায় বাঁশ কিংবা তাল গাছের ফ্রেমে টালি চাপানো। একপাশে বড় বড় কয়েকটা উন্থনে গন্‌গনে আঁচে মাংস কিংবা তড়কা ফুটছে। কোনটাতে কেউ চিমটি হাতে চট্‌পট্ যবের আটার রুটি সেঁকছে। আর তৈরী হচ্ছে চা।

আমি কাছাকাছি একটা পুকুরে নেমে মুখে হাতে জল দিয়ে এসে একটা খাটিয়ায় বসলাম। এতক্ষণে অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। বত্রিশটা গাড়ীর লম্বা লাইন অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে গেছে। শেষের গাড়ীগুলো অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে গরম যেন কলকাতার চেয়েও বেশী। সারাদিন গাড়ীর মধ্যে বেশ গরম লাগছিল। তবে গরমের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর হাওয়া আছে। ড্রাইভাররা প্রায় সবাই খাওয়া-দাওয়া কিংবা গল্প-গুজবে মত্ত। একা যতিন মিস্ত্রী শুধু এ গাড়ী ও গাড়ী ঘুরে ঘুরে মেকানিকের দায়িত্ব পালন করছে। আজ সারাদিনে যে সব গাড়ীতে ডিফেক্ট বেরিয়েছে তারা ইনচার্জ মিশ্রজীর কাছে গাড়ীর নাম্বার জানিয়ে রিপোর্ট করেছে। মিশ্রজী বারোঘোড়ায় পৌঁছেই যতিন মিস্ত্রীর হাতে রিপোর্ট বই ধরিয়ে দিয়েছেন। যতিন গাড়ীর নাম্বার মিলিয়ে ডিফেক্ট সারছে।

রাত সাড়ে আটটা বাজল। আমি মাংসের তড়কা আর তান্দুরি রুটি খেলুম। তড়কা মন্দ লাগল না। বিহারের তড়কা বাংলার মুগ কড়াই সিদ্ধ। পালা-পার্বনে বাংলার মেয়েরা কখনও কখনও তেল নুন দিয়ে মুগকড়াই সিদ্ধ খায়। একবার রেশনে চালের অভাবে বাংলার শহরাঞ্চলের মানুষদের দীর্ঘদিন ধরে এই মুগকড়াই ছিল চালের বিকল্প প্রধান খাদ্য। তখন বাড়ীর মেয়েরা কতরকম কায়দা করে মুগকড়াই সিদ্ধ করেছে। কত যত্ন, কত পরিশ্রম তার। কিন্তু তবু তারা বিহারের পুরুষদের তৈরী তড়কার স্বাদ আনতে পারে নি। কনভয়ের ড্রাইভারদের কাছে তড়কা আর রুটি এক অতি উপাদেয় খাদ্য।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে ব্যানার্জীকে খুঁজছি। এমন সময় একটা বাঁশির শব্দ পেলুম। কলকাতার ট্রাফিক পুলিশ কখনও কখনও এক ধরনের লোহার লম্বাটে বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়ার ইঙ্গিত দেয়—এ বাঁশীর শব্দ

কতকটা সেই রকম।

আমি কিছু বুঝে ওঠবার আগের ড্রাইভাররা যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর অন্ধকারে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই গাড়ীতে গাড়ীতে আলো জ্বলে উঠল। ড্রাইভাররা দেখলাম গাড়ীর মধ্যে কি সব গোছগাছ করছে। এমন সময় যতিন মিস্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে হোটেলে ঢুকল। একটু পরে নিজেই হাতে করে এক প্লেট তড়কা, চারখানা রুটি, বড় বড় কয়েক টুকরো পিঁয়াজ, আর খানিকটা কাঁচা তেঁতুলের টক্ নিয়ে আমার সামনের খাটিয়ায় বসতে যেতেই আমাকে দেখে প্লেটশুদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, নমস্কার বাবু। এত সকাল সকাল শোওয়া অভ্যেস নেই বুঝি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। এগারোটার কমে বাড়ীতে শোওয়া হয় না। মাঝে মাঝে বরং আরও রাত হয়ে যায়।

কাঁচা পিঁয়াজের টুকরো তেঁতুলের টকে ডুবিয়ে একটা বড় রকমের কামড় বসিয়ে যতিন মিস্ত্রী বলল, এখানে কিন্তু ওটি হবার যো নেই বাবু। রাত ন'টা বাজলে আর রক্ষে নেই। শুনতে পেলেন না বাঁশী বাজল?

আমি বললাম, হ্যাঁ। কিসের বাঁশী?

যতিন মিস্ত্রী বলল, ওই যে শোওয়ার বাঁশী। যেমন সূর্য ডুবলে আর গাড়ী চালাবার উপায় নেই। তেমনি রাত ন'টার বাঁশী বাজলে আর জেগে থাকার উপায় নেই। আবার ধরুন সূর্য উঠলে আর ঘুমোবারও উপায় নেই।

আমি ঘড়ি দেখলাম। ন'টা দশ। বললাম, তোমার তো তাহলে দেরী হয়ে গেল মিস্ত্রী।

যতিন ঘাড় নেড়ে বলল, আঁজ্ঞে না। আমার পনের মিনিট ছাড়। আমি যে ব্রেকডাউন-কার চালাই।

কেরোসিনের আলোয় খুব কাছ থেকে যতিন মিস্ত্রীকে দেখতে

পাচ্ছি আমি। মাঝারি সাইজের বেশ রুক্ষ চেহারা তার। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আমি বললাম, তোমাদের কনভয়ের নিয়ম-কানুন তো খুব কড়া।

যতিন বলল, হ্যাঁ বাবু। বিশেষ ক'রে মিশ্রজীর কাছে একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। একেবারে মিলিটারি নিয়ম।

—কিন্তু এত সকাল সকাল তোমাদের ঘুম আসে?

—কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ে। আবার অনেকে জেগেও থাকে। শুলেই কি আর ঘুম আসে বাবু। কত রকমের চিন্তা।

যতিন মিস্ত্রী খাওয়া শেষ ক'রে ঢক্ ঢক্ করে দু-গ্লাস জল খেয়ে উঠে পড়ল। তারপর দাম মিটিয়ে ফিরে এসে বলল, চলুন বাবু, গাড়ীতে ব'সে ব'সে গল্প হবে। নইলে মিশ্রজী আবার ফাইন্ করে দেবে।

আমি উঠতে উঠতে ঘড়ি দেখলাম, কাঁটায় কাঁটায় ন'টা পনের। চলতে চলতে বললাম, কি ফাইন করবে?

যতিন মিস্ত্রী দাঁতে কাঠি দিতে দিতে বলল, অনেক রকম ফাইন আছে। পেমেন্ট কম দিতে পারে, গাড়ী বদ্‌লে দিতে পারে, এমন কি বসিয়েও দিতে পারে।

—কিন্তু তুমি তো মেকানিক? ব্রেকডাউন কার-এ তোমারই তো থাকার কথা। তাহলে তোমাকে অন্য গাড়ী দিলে তোমার গাড়ী কে চালাবে?

—আমি ছাড়া আরও দু-জন মেকানিক্ আছে। ভ্রমর শিং আর রামকুমার। তাছাড়া প্রত্যেক ড্রাইভারই এক একজন খুদে মেকানিক। অল্প-বিস্তর মেরামতি কাজ সকলেরই জানা আছে।

দরজা খুলতেই গাড়ীতে আলো জ্বলে উঠল। পেছনের সীটে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ সরিয়ে যতিন মিস্ত্রী আমায় বসতে বলল। আমি ভেতরে যেতে সে নিজের সীটে গিয়ে বসল।

দরজা বন্ধ করতেই আলো নিভে গেল। যতিন সুইচ টিপে

আবার আলো জ্বেলে বলল, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা সিগারেট খাই।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, নিশ্চয়ই খাবে। এতে আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে?

যতিন সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলল, না বাবু। আমরা তা পারি না। সিগারেটের নেশা করেছি বটে কিন্তু লজ্জা এখনও ত্যাগ করতে পারি নি। তবে আমাদের ছেলেরা এসব মানে না।

আমি মৃদু হাসলাম। কোন উত্তর দিলাম না।

যতিন নিজেই বলে চলল, আমার দুটো ছেলের কেউ মানুষ হ'ল না বাবু। বড়টাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলাম। হ'ল না। থিয়েটার থিয়েটার করে সর্বস্ব খোয়ালে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কত বয়স হ'ল বড় ছেলের?

যতিন বলল, এই বোশেখে একুশে পড়েছে। ঠিকমত পড়লে এতদিনে দু-তিনটে পাশ করে ফেলত। ওর সঙ্গে যারা পড়ত তারা সব চাকরীতে ঢুকে গেল।

—কি থিয়েটার করে?

—বলে তো পুতুল থিয়েটার। আমি কোনদিন যাই নি। ওর মা আর আমার ছোট মেয়েটা নাকি একদিন দেখেছিলো। বললে, খুব সুন্দর। কিন্তু তাতে তো আর পেট ভরবে না।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিসের থিয়েটার করে যতিনের ছেলে। জিজ্ঞেস করলাম, কি থিয়েটার? কিছু নাম-টাম জানা আছে?

যতিন বলল, আমি কিছুই জানি না। ক'দিনই বা বাড়ী থাকি যে খোঁজ-খবর নোব। দিনের পর দিন তো রাস্তাতেই কেটে যাচ্ছে। তবে শুনেছি ফি রোববারে হাতি বাগানের কাছে কি একটা থিয়েটারে যেন যায়। মাঝে মাঝে দু-একবার গোটা কতক টাকা এনে ওর মার হাতে দিয়েছিল। কি টাকা, কত টাকা আমি দেখি নি। ওর মা-ই

বলছিল থিয়েটার থেকে টাকা পেয়েছে। সে ওর মা জানে আর ওই জানে।

আমি বললাম, তোমাকে কোনদিন থিয়েটার দেখতে যেতে বলে নি?

সিগারেট ফেলে দিয়ে আলো নিভিয়ে যতিন বলল, তা বলে বটে। কিন্তু বললে কি হবে, আমার সময় কোথা?

কথাটা বলে যতিন মিস্ত্রী হাত বাড়িয়ে পেছনের সিট থেকে একটা ঝোলা নিয়ে তার ভেতর থেকে ছোট একটা টিনের গোল চাক্তি বার করে আমায় দেখিয়ে বলল, এই যে। এটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন।

চাক্তি হাতে নিয়ে আমি অন্ধকারে ঝুঁকে বসলাম।

যতিন আবার আলো জ্বালল।

দেখলাম, নীল রঙ এর গোল চাক্তির মাঝখানে সাদা জমির ওপর কালো রঙের একটা পুতুলের ছাপ। নিচে কলকাতার এক বিখ্যাত পাপেট থিয়েটার গোষ্ঠীর নাম।

আমি অবাক হলাম। মনে মনে যতিনের ছেলেকে বাহবা না দিয়ে পারলাম না। চাক্তিটা ফেরত দিয়ে বললাম, তোমার ছেলে খুব ভাল থিয়েটারে আছে যতিন। যদি টিকে থাকতে পারে তাহলে উন্নতি করবে।

যতিন বলল, থিয়েটারে উন্নতি ক'রে কি হবে বাবু? আমরা গরিব মানুষ। আমাদের ওসব সাজে না।

আমি বললাম, যতিন, তুমি বুঝতে পারছ না। এরা খুব নামজাদা দল। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে এদের বাইরে যাবার খবর বেরিয়েছিল। বাইরে মানে অনেক দূরে। ইউরোপে। তোমার ছেলে এসব খবর নিশ্চয়ই জানে।

আবার আলো নিভিয়ে যতিন বলল, জানে বলেই তো বলছি বাবু সে সর্বস্ব খোয়ালে। আজ ক'বছর ধরে এই থিয়েটারের

পেছনেই লেগে আছে। ওর মাকে কতবার বলেছি, আমি বাড়ী থাকি না ছেলেটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অন্য কাজে ঢুকতে বল। তা ওর মা বলে, ছেলেকে বললে ছেলে বলে, দাঁড়াও না আগে বাইরেটা ঘুরে আসি। তারপর দেখবে নিজেই দল করব।

আমি উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ছেলে তাহলে ইউরোপ গেছে?

যতিন একটু চুপ ক'রে থেকে ঘাড় নেড়ে বলল, না বাবু। ওরা ওকে নিয়ে যায় নি। অথচ আমার ছেলে ওর মাকে বলেছে, যাদের ওরা নিয়ে গেছে তারা সব নতুন ঢুকেছে। অনেকে নাকি থিয়েটার বোঝেই না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যতিন মিস্ত্রী বলল, তাইত বলছি বাবু, মটর মেকানিকের ছেলের ওসব ঘোড়া রোগ ভাল নয়।

আমি বুঝলাম, যতিন দুঃখ পেয়েছে। সান্ত্বনা দেবার সুরে বললাম, তা কেন বলছ যতিন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন সাহেব একজন ছুতোরের ছেলে ছিলেন।

যতিন বলল, হ'তে পারে বাবু। তবে সে দেশটা আমেরিকা।

ব্যানার্জীর ডাকে ঘুম ভাঙতেই আড়মোড়া ভেঙে পা ছড়াতে যেতেই পা আটকে গেল। হকচকিয়ে চোখ মেলতেই বুঝতে পারলাম গাড়ীর মধ্যে শুয়ে আছি। মাথায় ঝোলা ব্যাগের বালিশ। হাঁটু মুড়ে শুয়ে দু'পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

গাড়ী থেকে নেমেই ঘড়ি দেখলাম। চারটে পঁয়ত্রিশ। জুন মাসের সকাল। বাংলা-বিহারের সীমানার আকাশ ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। বাতাসে ভোরের ঠাণ্ডা।

মনে পড়ল, কাল রাতে যতিন মিস্ত্রীর সঙ্গে গল্পে বেশ জমে

গিয়েছিলাম। তারপর এক সময় ব্যানার্জী গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে।

সকালের প্রাতঃরাশ সেরে চা খাওয়া শেষ করতে সাড়ে পাঁচটা বাজল। মিশ্রজীর ড্রাইভার চরণ শিং এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল।

কাল রাতে শিউশংকর মিশ্র কাছেই একটা পেট্রোল পাম্পের অফিস ঘরে খাটিয়া পেতে শুয়েছিল। মিশ্রজীর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। তার ওপর হাঁপানির ধাত্। গরম সহ্য হয় না। অথচ একেবারে ফাঁকায় শুতে সাহসও হয় না। বলা যায় না। শরীর গোলমাল করলে মহা বিপদ। বিরাট দায়িত্বের বোঝা তার মাথায়। কম ক'রে সাতদিন লাগবে এ বোঝা হাল্‌কা হ'তে।

কলকাতা থেকে বোম্বাই একুশশো কিলোমিটার রাস্তা। গাড়ী চলবে সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা। মাঝে নাস্তা, লাঞ্চ আর বিকালে চা খাবার জন্য কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম। ধরা যাক, গাড়ী চলবে সারাদিনে ন'ঘণ্টা। গাড়ীর গতিসীমা গড়ে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। তাহলে সারাদিনে গাড়ী রান করবে গড়ে তিনশো মাইলের কিছু বেশী। এভাবে বোম্বাই পৌঁছোতে মোট সময় লাগবে ছ'দিন। মাঝে গাড়ী খারাপ হ'লে মেরামতির জন্য হাতে সময় থাকল আরও একদিন। তাহলে মোট সময় লাগল প্রায় সাতদিন।

এই সাতদিনে কনভয় ইনচার্জ শিউশংকর মিশ্রের অনেক কাজ। বত্রিশটি গাড়ীর বত্রিশ জন ড্রাইভারের সবরকম অসুবিধে তাকে লক্ষ্য করতে হবে। গাড়ীতে সময় মত পেট্রোল নেওয়া, মেকানিক্যাল ডিফেক্ট সারাবার ব্যবস্থা করা, স্পীড কণ্ট্রোল করানো, ড্রাইভারদের হাতখরচ দেওয়া, ঠিক সময়মত ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং চা খাবার জন্য গাড়ী হল্ট করা, ড্রাইভারদের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া, সকালে ঠিক সময়ে গাড়ী মার্চ করানো, সন্ধ্যায় ঠিক জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়ী হল্ট করা।

এ তো গেলো রাস্তায়। এরপর ডেসটিনেশনে পৌঁছে ড্রাইভার-

দের ফুল পেমেণ্ট দিয়ে যে কোম্পানার গাড়ী সেই কোম্পানীর কাছে গুড্ কণ্ডিশনে সমস্ত গাড়ী হ্যাণ্ড ওভার না করা পর্য্যন্ত মিশ্রজীর ছুটি নেই।

আমি যেতেই শিউশংকরবাবু আমায় বসতে বললেন। তারপর ড্রাইভার মহম্মদ আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখিয়ে দাসবাবু। এইসব ড্রাইভার নিয়ে আমাকে কনভয় কণ্ট্রোল করতে হয়। লেকিন্ আইন আইন হ্যায়। তাকে তো মানতে হোবে। না মান্‌লে আমার বদ্‌নাম হোবে।

আমি মিশ্রজীর কথা ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে আন্দাজে বুঝলাম, কিছু গোলমাল হয়েছে। মহম্মদ আলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। কিন্তু কালো হ'লেও মহম্মদের চোখে-মুখে একটা জ্বলজ্বলে ভাব আছে। ডান দিকের কানের নিচে থেকে দাড়ির ধার ঘেঁসে একটা গভীর ক্ষতের দাগ। চোখের মণিদুটো স্থির ক'রে ঘাড় বাঁকিয়ে মহম্মদ আলি আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমার ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে মনে হ'ল, মহম্মদ আলির জ্বলজ্বলে চোখ মুখের ভেতর একটা ভয়ংকর কিছু লুকিয়ে আছে।

চোখ নামিয়ে আমি মিশ্রজীর দিকে তাকাতেই শিউশংকর-বাবু বললেন, কাল দুপুরে খড়াপুরের কাছে মহম্মদ আলি দুজন সওয়ারি তুলেছিল। তার মধ্যে একজন জানানা ছিল। বিশ মাইল দূরে তারা নেমে গেছে। লেকিন্ ই লোক কাহে এইসা কিয়া। ইট ইজ আউট অফ্ ল এ্যাণ্ড অল্‌শো পানিশেবল্। আপ হামারা গেষ্ট হ্যায়। এ্যাণ্ড এ নিউটল ওয়ান। ইউ প্লিজ জাজ ইট।

আমি মহাফাঁপরে পড়লাম। একদিকে কন্‌ভয় ইন্‌চার্জের অনুরোধ অন্যদিকে মহম্মদ আলির পাথরের মত স্থির চোখের

চাহনী। একটু ইতস্ততঃ করে চোখ তুলতেই ব্যানার্জীর চোখে চোখ পড়ল। পাম্প হাউসের কাঁচের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ টিপে মহম্মদ আলিকে ছেড়ে দেবার জন্য সে আমায় ইসারা করল।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বেশ সহজ হয়ে মিশ্রজীর দিকে তাকিয়ে বললাম, এবারের মত ওকে ছেড়ে দিন। আমি বলছি ও আর এমন কিছু করবে না যাতে আবার নিয়ম ভাঙতে হয়।

মিশ্রজী হঠাৎ যেন খানিকটা দমে গেলেন। আমার এ ধরনের বিচার বোধহয় তিনি আশা করেন নি। গলার স্বর নামিয়ে খুব শান্তভাবে মহম্মদ আলির দিকে না তাকিয়েই শুধু ইসারা করে বললেন, যাও, আপনা কাম করো।

এদিকে যতক্ষণ মহম্মদ আলির বিচারপর্ব চলছিল ততক্ষণে নন্দলালের নেতৃত্বে গাড়ীপিছু কুড়ি লিটার ক'রে পেট্রোল নেওয়া হ'য়ে গেল। গতকাল সকালে হিন্দুস্থান মটর থেকে বেরুবার সময় প্রতি গাড়ীতেই পঁয়ত্রিশ লিটার ক'রে পেট্রোল ছিল। এই পঁয়ত্রিশ লিটার পেট্রোল মোটর কোম্পানীর নিজস্ব দেওয়া। মাঝে বোম্বে রোডের পাম্প থেকে কাল তিন লিটার ক'রে পেট্রোল নেওয়া হয়েছে। মোট আটত্রিশ লিটার পেট্রোলের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে গড়ে কুড়ি লিটার। ট্যাঙ্কে আছে আঠার লিটার। এক একটা গাড়ীর ট্যাঙ্কে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন লিটার পেট্রোল ধরে। কিন্তু ট্যাঙ্ক ভর্তি ক'রে পেট্রোল কখনও নেওয়া হয় না। তার প্রধান কারণ, রাস্তায় গাড়ী হল্ট করার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প। শহরের বাইরের পেট্রোল পাম্পে তাই গাড়ী পার্ক করার জন্য অনেকখানি জায়গা থাকে। প্রায় প্রতি পাম্পের সংলগ্ন ছোট বড় হোটেল। কনভয় বা ট্রান্সপোর্টের গাড়ীর পার্ক করার কোন খরচ লাগে না এখানে। বিনিময়ে কিছু পেট্রোল নিতে হয়। লিটার পিছু মটর গাড়ী গড়ে যায় দশ থেকে এগার

কিলোমিটার। সেইমত হিসাব ক'রে পরবর্তী পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল নেবার জন্য প্রতিটি গাড়ীর ট্যাঙ্কে জায়গা রাখতে হয়। এছাড়া এমারজেন্সীর জন্য ব্রেকডাউন কার-এ কয়েক টিন পেট্রোল সব সময় মজুত থাকে।

ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ছ'টা। শিউশংকর মিশ্র গাড়ী লাইনিং করার নির্দেশ দিলেন। পর পর গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। এইভাবে লাইনিং করার নিয়মও আছে। দু'টি গাড়ীর মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুতে যেন একটি গাড়ী রাখার মত জায়গা থাকে।

এরপর মার্চ।

গাড়ী চলতে শুরু করল। ওয়ান···টু···থ্রি···ফোর···থার্টি টু···

একটু এগিয়েই একটা তেমাথার মোড়। আমাদের সামনে দু'দিকে দুটি রাস্তা। একটি টাটার দিকে চলে গেছে, অন্যটি উড়িষ্যায়। আমরা উড়িষ্যার রাস্তা ধরলাম।

আমি ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করলাম, এরপর আমরা কোথায় থামব?

ব্যানার্জী বলল, কেওনঝড়।

আমি সিটের ওপর পা ছাড়িয়ে হ্যারল্ড রবিনশ্-এর একটা নোভেল নিয়ে বসলাম।

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক পর কোলের ওপর বই উল্টে রেখে বাইরে তাকালাম।

উড়িষ্যার ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ী যাচ্ছে। চক্‌চকে মসৃণ কালো পিচের ন্যাশান্যাল হাইওয়ে ভেলভেটের মত নিজেকে বিছিয়ে রেখেছে। পথের দু'পাশে গাছের সারি। অধিকাংশই জাম গাছ। ছোট, বড়, মাঝারি। এখন জুনের শেষ। গাছভর্তি জাম দেখে আমি অবাক হলাম। এত জাম হয়েছে যে গাছের সবুজ পাতা কালো জামের থোকার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। গাছের নীচে, কিছু রাস্তায় বাকি সবুজ ঘাস জুড়ে প'ড়ে থাকা জামের ছড়াছড়ি।

আমার মনে পড়ল, আমাদের পাড়ার সরকারী পলেটেক্‌নিক্‌ কলেজের ভেতরে একটা জামগাছের কথা। বৈশাখের স্থুরু থেকেই তিনটে পাড়ার কয়েক ডজন ছোট বড় স্কুলের ছেলের হাত থেকে সরকারী গাছের ফল বাঁচাবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার বহর দেখলে রবীন্দ্রনাথের 'এক বিঘা জমি'-র কথা মনে পড়ে। অথচ উড়িষ্যার এই পথের পাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে শতশত জামগাছ। এও তো সরকারের অধীন। কিন্তু এখানে কোন স্কুলের ছেলেও নেই আর ফল রক্ষা করার কোন চেষ্টাও নেই। কতশত ফল যে প্রতিদিন কত গাড়ীর তলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কে তার হিসাব রাখছে।

আমার কেমন লোভ হ'ল। মনে হ'ল গাড়ী থামিয়ে ছুটে গিয়ে কোঁচড় ভর্তি করে জাম নিয়ে আসি। কিন্তু না। লোভ দমন করতে হ'ল। আমি এখন নিয়মের অধীন। নিয়ম ভাঙলে শাস্তি।

শাস্তির কথা মনে হতেই মহম্মদ আলিকে মনে পড়ল। মনে পড়ল তার সেই চোখ ছুটোর কথা। কি ভয়ংকর স্থির তার চোখের মণিদুটো।

আমি ব্যানার্জীর দিকে তাকালাম। একমনে গাড়ী চালাচ্ছে। স্পিড্‌-ও-মিটারের কাঁটা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে।

লুকিং গ্লাসের ভেতর দিয়ে ব্যানার্জীর চোখে চোখ পড়ল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মহম্মদ আলির বিচারের সময় তুমি অমন ভাবে আমায় ইসারা করলে কেন?

ব্যানার্জী হাসল। ছোট্ট ক'রে মিষ্টি হেসে আমায় পাল্টা প্রশ্ন করল, আমি ইসারা না করলে আপনি মহম্মদের কি বিচার করতেন?

আমি প্রকৃত বিচারকের মত রায় দিলাম, নায্য বিচার। কিছু একটা সাজা দিতাম।

ব্যানার্জী বলল, ভুল করতেন।

অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, কেন?

ব্যানার্জী খুব সহজ ভাবে উত্তর দিল, মহম্মদ আলি কাউকে তোয়াক্কা করে না। আজ পর্য্যন্ত কেউ ওকে সাজা দিতে পারে নি।

আমার কেমন জেদ চাপল। বললাম, এ কেমন কথা? অন্যায় করলে শাস্তি পাবে না? যারা সাজা দেয় নি তারা আমারই মত ক্ষমা করেছে।

ব্যানার্জী দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, না। ক্ষমা নয়। তারা আপনার মতই ওর অন্যায়টাকে মেনে নিয়েছে।

আমি প্রতিবাদ করলাম, কক্ষনো নয়। তোমার জন্যেই আমি ওকে ক্ষমা করলাম। নইলে শিউশংকরবাবুকে অসন্তুষ্ট করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

ব্যানার্জী মৃদু হেসে বলল, আপনি মহম্মদ আলিকেও চেনেন না আর শিউশংকর মিশ্রকেও চেনেন না।

এবার আমার রাগ হ'ল। দু-বছর ধরে মিশ্রজীকে দেখছি। না চেনার কি আছে। আর মহম্মদ আলিকে আমার চেনার দরকার নেই। অমন ভয়ংকর স্থির চোখ আর বিভৎস ক্ষতওয়ালা একজন ড্রাইভারকে অত ভাল ক'রে চেনার ইচ্ছেও নেই আমার।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে ব্যানার্জী বলল, আপনি হয়ত বুঝতে পারেন নি। আপনার এই বিচারে সবচেয়ে খুশী হয়েছেন শিউশংকর মিশ্র নিজে।

এবার আমার কেমন খট্‌কা লাগল। ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে। মিশ্রজীর চোখ মুখ দেখে আমার ধারণা হয়েছিল মহম্মদকে শাস্তি না দেওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

ব্যানার্জী বলল, ঐ মহম্মদ আলি এক দুর্দান্ত গুণ্ডা। অন্যায় করেছে জেনেও মিশ্রজীর সাধ্য নেই যে ওকে শাস্তি দেন। কিন্তু এতগুলো ড্রাইভারের সামনে কনভয়ের নিয়ম ভংগ করা সত্ত্বেও মহম্মদকে ক্ষমা করলে ইন্‌চার্জ হিসাবে মিশ্রজীর বদনাম হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধি করে মিশ্রজী আপনার ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দিলেন।

যাতে প্রত্যক্ষভাবে মহম্মদ আলির শাস্তির জন্য তিনি দায়ী না হন।

আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। মিশ্রজীকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। অথচ সেই মিশ্রজী নিজের সম্মান রক্ষার জন্য আমায় শিখণ্ডি খাড়া করালেন। ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগছে আমার কাছে। সময়মত ব্যানার্জী ইসারা না করলে সমস্ত ব্যাপারটাই শেষ পর্য্যন্ত একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করত।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ব্যানার্জীর দিকে তাকাতেই আবার লুকিং গ্লাসে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল।

ব্যানার্জী আগের মতই মুচকি হেসে বলল, মিশ্রজীর ওপর রাগ করবেন না। উনি খারাপ লোক নন। নিরুপায় হ'য়ে আপনার শরণাপন্ন হলেও আপনি যে ওনাকে রক্ষা করেছেন এর প্রতিদান উনি নিশ্চয়ই দেবেন। আমি আজ দশ বছর ওনার ইন্‌চার্জে কনভয়ে আসছি। আমি ওনাকে চিনি।

ব্যানার্জীর কথাগুলো আমার ভাল লাগছিল। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তাছাড়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়েই আমার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছে। কলকাতার অফিসে ব্যানার্জীকে আমি মাত্র দু-একবার দেখেছি। অথচ বত্রিশজন ড্রাইভারের মধ্যে বাজোরিয়া' দেখে দেখে ওর গাড়ীতেই আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ব্যানার্জীকেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব'লে মনে করেছেন।

আমি আর কথা না বলে আবার বই খুলে বসলাম। কিন্তু আর পড়ায় মন বসল না। বইএর অক্ষর ছাপিয়ে মহম্মদ আলির মুখের ছবি বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। মহম্মদ আলি দুর্দান্ত গুণ্ডা। তার ডান দিকের দাড়িতে ঐ গভীর ক্ষত হয়ত গুণ্ডামি করতে গিয়েই হয়েছে। কিন্তু ছিপছিপে ঐ চেহারায় গুণ্ডামি করার শক্তি কোথায় মহম্মদ আলির? দেখে তো মনে হয় একটা চোদ্দ বছরের স্কুলের ছেলের সঙ্গে দৈহিক শক্তির পরীক্ষায় হেরে

যাবে সে। অথচ তাকে দেখেই মিশ্রজীর মত ঝানু ইন্‌চার্জও ভয় পায়।

গাড়ী কেওনঝড়ে এসে থামল্‌। আজ দুপুরের লাঞ্চ এখানেই সেরে নেওয়া হবে। এরপর মাঝে আর কোথাও গাড়ী থামানো হবে না। একেবারে সম্বলপুরে নাইট হল্ট হবে।

ব্যানার্জী আমায় নিয়ে একটা হোটেলে ঢুকল। অপরিচ্ছন্ন সস্তা হোটেল। কতকগুলো কাঠের টেবিল আর ছোট ছোট বেঞ্চ পাতা। টেবিলগুলো নড়বড়ে। কতকালের ময়লা জমে কাঠের রঙ কালো হয়ে গেছে। আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না।

ব্যানার্জী বোধহয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি হাঁকডাক করে ভাল কাপড় দিয়ে টেবিল মুছিয়ে আমায় বসতে বলে সোজা রান্না ঘরে ঢুকে গেল। তারপর বামুন ঠাকুরের সংগে আধা উড়িয়া আধা বাংলায় আমাকে কি কি খেতে দেবে তার ফরমাস দিতে লাগল।

দোকানে অনেকগুলো ঠাকুর আর অল্পবয়সী কর্মচারী রয়েছে। দেখলাম, তারা সবাই ব্যানার্জীকে চেনে। সকলেই হেসে হেসে এটা সেটা জিজ্ঞেস করছে। কলকাতার খবর নিচ্ছে।

একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে ব্যানার্জী আমার টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে নিজেও অন্য টেবিলে বসে পড়ল।

একেবারে বাড়ীর খাবার। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, আলুভাজা, পোস্ত, মাছের ঝোল, লাউ এর চাটনি মায় নুন লেবু পর্য্যন্ত।

আমার খেতে খুব ভাল লাগছিল। দোকানের চেহারার সঙ্গে রান্নার আকাশ-পাতাল তফাৎ। এমন রান্নার স্বাদ অনেককাল পাইনি। খুবই পরিতৃপ্তি হয়ে খেতে খেতে হঠাৎ ব্যানার্জীর পাতের

দিকে তাকালাম। সামান্য একটু পোস্ত আর ডাল চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাচ্ছে।

আমার খুব খারাপ লাগল। খাওয়া থামিয়ে ব্যানার্জীকে মাছের ঝোল নিতে বললাম।

ব্যানার্জী আপত্তি করল।

আমি শুনলাম না। প্রায় জোর ক'রে একজন কর্মচারীকে ডেকে ওর পাতে মাছ আর ভাত দিতে বললাম।

ব্যানার্জী খুব লজ্জায় প'ড়ে চারদিক তাকাতে লাগল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে আমি দেখলাম হোটেল জুড়ে সবকটা টেবিলেই আমাদের লোকেরা খাচ্ছে। সকলের পাতেই ব্যানার্জীর মতই অল্প তরকারী।

ব্যানার্জীর টেবিলে কর্মচারী মাছ আর ভাত দিয়ে গেল। অন্যেরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

আমি মাথা হেঁট করে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ব্যানার্জীকে রেখেই বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

খাওয়া-দাওয়া সারতে আমাদের প্রায় পৌনে একঘণ্টা সময় লাগল। দেখলাম পাশাপাশি কয়েকটা একই রকম হোটেলে সকলেই কেউ ভাত কেউ রুটি করে লাঞ্চ সারল। কিন্তু শিউশংকর-বাবুকে তো কোথাও দেখছি না। গাড়ীগুলোর দিকে চোখ বুলালাম। রাস্তার দু'পাশে লাইন দিয়ে গাড়ী দাঁড় করানো। কই মিশ্রজীর গাড়ী তো লাইনে নেই। মনে মনে ভাবলাম, তাহলে বোধহয় কাছাকাছি কোন বড় হোটেলে লাঞ্চ সারতে গেছেন। হঠাৎ চরণ সিং কে দেখলাম। পান চিবোতে চিবোতে আমার পেছনেই মুক্তি ঝা-র সঙ্গে দেশওয়ালি ভাষায় কি সব কথাবার্তা বলছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার! তুমি এখানে? তাহলে মিশ্রজীর গাড়ী নিয়ে কে হোটেলে গেল?

চরণ শিং অবাক হয়ে বলল, হোটেল! কেন হোটেল?

আমি বললাম, মিশ্রজী হোটেলে খেতে যাননি?

চরণ সিং বলল, নেহি সাব্। বাবুজী হোটেল মে কভি নেহি খাতা।

—তাহলে খাবেন কি?

—ঘরসে মিঠাই লে আয়া। আউর ইধার এক গ্লাস দুধ লে লিয়া। ব্যাস্।

—উনি গেলেন কোথায়?

রাস্তার উল্টো দিকে একটা খড়ের দোকান দেখিয়ে চরণ সিং বলল, দুকান কা অন্দর মে শো গিয়া। থোড়া সে আরাম কর লেতা।

আমি বললাম, তাহলে গাড়ী?

চরণ সিং বলল, উধার মে খাড়া হ্যায়।

আমাদের কথাবার্তার মাঝেই ব্যানার্জী এসে গিয়েছিল। আমার হাতে একটা পান দিয়ে বলল, মিশ্রজী সারাদিনে যেখানেই সুযোগ পান একটু-আধটু ঘুমিয়ে নেন। সারারাত আবার জাগতে হবে তো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি রাত্তিরে ঘুমোন না?

পিক্ ফেলে ব্যানার্জী বলল, না। কনভয়ে বেরিয়ে উনি কখনো হোটেলে খান না আর রাত্তিরে ঘুমোন না। আসলে কাছে অনেক টাকাকড়ি থাকে। তাছাড়া এতগুলো গাড়ীর দায়িত্ব বলতে গেলে ওনার ওপরেই। ঘুম কি আর চোখে আসে।

এক ঘণ্টার ওপর সময় চলে গেলো। চরণ সিং রাস্তা পেরিয়ে খড়ের দোকানে ঢুকল। বোধহয় মিশ্রজীর ঘুম ভাঙাতে গেল।

আমি আর ব্যানার্জী কথা বলতে বলতে গাড়ীর দিকে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা সোরগোল শুনতে পেলাম। পিছন ফিরে দেখি

একটা অচেনা লোককে আমাদের কয়েকজন ড্রাইভার ঘিরে ধরেছে।

ব্যানার্জী আর আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। একজন ষণ্ডামার্কা লোক হাত-পা ছুঁড়ে যা তা গালিগালাজ করছে আর শার্দুল সিং-এর সঙ্গে জোর বচসা করছে।

আমাকে দেখেই লোকটি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। তারপর হিন্দিতে যা বলল তার বাংলা মানে হল, লোকটি সম্বলপুর যাবে। তাকে আমাদের গাড়ী ক'রে না নিয়ে গেলে একটা গাড়ীও সে এখান থেকে যেতে দেবে না।

ব্যানার্জী আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। লোকটিকে কি বলতে যাচ্ছিল। সে বাধা দিয়ে বলল, তুমলোগ্ সব চামচা হ্যায়। চুপচাপ খাড়া রও। ম্যয় ইন্চার্জকা সাথ বাত বোলতা।

ব্যানার্জী রেগে গিয়ে আবার কি বলতে যাচ্ছিল।

আমি বাধা দিয়ে লোকটাকে বললাম, আমি ইন্চার্জ নই।

লোকটা সংগে সংগে চোখ পাকিয়ে বলল, ঝুটা মত বোলিয়ে।

এমন সময় চরণ সিং গাড়ী এনে দাঁড় করালো। শিউশংকরবাবু গাড়ীর মধ্যে বসে ছিলেন। লোকটা হঠাৎ তীরের মত ছুটে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে মিশ্রজীকে জোর করে নামিয়ে আনার চেষ্টা করল।

ব্যাপারটা খুবই অশোভন দেখাচ্ছিল। কিন্তু লোকটার ষণ্ডা মার্কা চেহারার জন্য তার ওপর জোর দেখাতে কেউ সাহস পাচ্ছিল না।

এদিকে মিশ্রজী কিছু একটা বোঝাতে চাইছিল কিন্তু লোকটা কোন কথাই শুনতে চাইছিল না। মিশ্রজীর হাত ধরে টানাটানি করতে করতে সে চিৎকার করছিল যে তাকে নিয়ে যেতেই হবে।

আমি ব্যানার্জীকে বললাম, মিশ্রজীকে বলনা ওকে সম্বলপুর পৌঁছে দিতে। কি দরকার ঝামেলা করার।

ব্যানার্জী বলল, তা হয় না। টুলস্ আর ড্রাইভার ছাড়া গাড়ীতে

আর কাউকে এলাও করা যায় না। এটা ভিকিলস্ এ্যাক্ট।

—এখানে কে আর এসব দেখতে আসছে?

—কিন্তু লোকটার মতলব কি তাও তো ঠিক নেই। কিছুদূর গিয়ে না বিপদে ফেলে।

—ও একা কি করবে?

—একা নয়। হয়ত সংগে দল আছে। কিছুই বলা যায় না।

এমন সময় মহম্মদ আলি এসে হাজির। কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে এগিয়ে গিয়ে লোকটার জামার কলার ধ'রে আচমকা সজোরে ঠেলে দিল। লোকটা মিশ্রজীকে ছেড়ে হিংস্র জন্তুর মত মহম্মদ আলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মহম্মদ বিদ্যুৎ গতিতে পিছিয়ে এল। লোকটা গাড়ীর গায়ে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। প্রায় সংগে সংগে মহম্মদ আলি তার দেহের ওপর বসে পড়ে দু-হাতের কনুই দিয়ে বিচিত্র কায়দায় ঘাড়ের ওপর মাত্র দু-বার সজোরে আঘাত করল। ব্যাস্, সম্বলপুরের যাত্রী কেওনঝড়ের পিচের রাস্তায় পড়ে কাটা পশুর মত ছটফট করতে লাগল।

কেওনঝড় থেকে সম্বলপুর প্রায় দু'শো একুশ কিলোমিটার রাস্তা। কন্ভয়ের নিয়ম অনুসারে ছ'টা বড়জোর সাড়ে ছটার মধ্যে গাড়ী হল্ট করতে হ'লে হাতে সময় আছে চার থেকে সাড়ে চার ঘণ্টা। গাড়ী তাই হু হু করে এগিয়ে চলেছে।

আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমার একটু ঢুলুনি ভাব এসেছিল। ভেবেছিলাম গাড়ীতে একটা ঘুম দিয়ে নেব। কিন্তু মহম্মদ আলির জাপানী যুযুৎসু দেখে ঘুম কপালে উঠে গেল। সত্যি! ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। অমন দৈত্যের মত ভারি

লোকটাকে ছিপছিপে মহম্মদ কত সহজে বেকায়দায় ফেলে দিল। ব্যানার্জী ঠিকই বলেছে। মহম্মমদ আলি দুর্দান্তই বটে।

গাড়ী যেতে যেতে হঠাৎ আস্তে হয়ে গেল। এতক্ষণ আমার সামনে বা পেছনের কোন গাড়ীই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এবার সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ীর সারি দেখতে পেলাম। রাস্তা মেরামত হচ্ছে। ওপাশ থেকে ভারী ভারী ট্রান্সপোর্টের লরীগুলো গোঁ গোঁ করে আমাদের পেরিয়ে চলে গেলো।

রাস্তার অনেকখানি জায়গায় পিচ্ নেই। নতুন করে খোয়া ফেলানো হচ্ছে। আদিবাসী মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে খোয়া বইছে। দু-জন পুরুষকে দেখলাম হাত বাড়িয়ে গাড়ী থেকে কিছু চাইছে। কাছে এগিয়ে যেতে ব্যানার্জী পকেট থেকে গোটা কয়েক বিড়ি বার করে তাদের হাতে দিল। পুরুষ দুজনের মুখ খুশিতে ভরে গেল।

গাড়ী আবার পিচের রাস্তায় পড়ল। সামনেই রাস্তার ধারে একটা হলদে টিনের বোর্ডে বাংলার "দ" অক্ষরকে মাত্রাহীন করলে যেমন দেখায় তেমনি কালো রঙের চিহ্ন আঁকা। সামনের গাড়ী-গুলো আর দেখা যাচ্ছে না।

ব্যানার্জীর থেকে শুনলাম, সামনের বাম দিকে রাস্তা ঘুরে জিগ্‌জ্যাগ্ হয়ে গেছে। আর বোর্ডের ঐ চিহ্নটা ট্রাফিক্ সাইন। মোটর ভিকেলস্ এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রত্যেক মোটর চালককেই এই সব সাইনের অর্থ বুঝে গাড়ী চালাতে হয়।

গাড়ী বামদিকে টার্ন নিল। তারপর ডাইনে। আবার বাম দিকে ফেরার মুখে রাস্তার দু-পাশে ঘন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, বড় বড় গাছের মোটা কাণ্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে কয়েকজন আদি-বাসী মেয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে।

আজ সকালে বারোঘোড়া থেকে গাড়ী ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা পর রাস্তার ধারে ধারে অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এমনি

ভাবে হাত নাড়তে দেখেছি। তারা কেউ কেউ মিলিটারি কায়দায় পা জোড়া ক'রে আমাদের স্যালুটও করছিল। আমার ভাল লাগছিল। সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে বেশ গর্ববোধ করছি-লাম। মনে হচ্ছিল, উড়িষ্যার শিশুদের এই অভ্যর্থনা তাদের নিজেদের কাছে হয়ত নেহাৎই ছেলেমানুষী। হয়ত বা মূল্যহীন। কিন্তু আমার কাছে এ অভ্যর্থনা অভাবনীয়। নিষ্পাপ শিশুদের আন্তরিক এ অভিনন্দন চিরকাল এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আমার অন্তরে জেগে থাকবে।

আদিবাসী রমণীদের হাত নাড়তে দেখে স্বভাবতই আমার হাত তাদের প্রত্যুত্তর দিতেই, ওরা গাছের আড়াল থেকে বাইরে এসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। আর তখনই লক্ষ্য করলাম দূরে দূরে জঙ্গলের ভেতর গাছের আড়ালে আড়ালে কয়েকটি গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই সময় ব্যানার্জী হঠাৎ বলে উঠল, আর হাত নাড়বেন না বাবু। মেয়েগুলো ভাল নয়।

আমি নিরেট বোকা ব'নে গেলাম। আমার হাসি হাসি মুখ ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যেন একটা মহা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি এমনি ভাবে অপরাধীর মত লুকিং গ্লাসের ভেতর দিয়ে ব্যানার্জীর দিকে তাকালাম।

ব্যানার্জী গিয়ার চেঞ্জ করে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিল।

সম্বলপুরের ইণ্ডিয়ান অয়েলের পেট্রোল পাম্পে গাড়ী যখন হল্ট করল ঘড়িতে তখন পৌনে সাতটা।

সেই কাল সকালে বাড়ী থেকে স্নান করে বেরিয়েছিলাম। আজ সারাদিনে মাথায় আর জল পড়ে নি। তাই সম্বলপুরে পৌঁছেই

অয়েল কোম্পানীর কলের জলে বেশ করে সাবান মেখে স্নান করে নিলাম। তারপর ঝরঝরে শরীর আর হালকা মন নিয়ে পাম্পের বাইরে রাস্তার ধারে একটা খাটিয়ায় বেশ আয়াশ করে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম।

ভারতবর্ষ ভ্রমণে যারা অভিজ্ঞ তারা নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলা-দেশের উত্তরে দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-কালিম্পং জুড়ে মস্ত মস্ত চায়ের বাগান। কিন্তু চা উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশে যদি কেউ উৎকৃষ্ট এককাপ তৈরী চায়ের সন্ধান করেন তাহলে বোধহয় তিনি ভুল করবেন। কেননা উৎকৃষ্ট তৈরী চাএর স্বাদ বাংলার বর্ডার না পেরুলে পাওয়া যাবে না। বাংলার বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশের তৈরী স্পেশাল চায়ের স্বাদ যারা একবার পেয়েছেন তাদের কাছে কলকাতার চা চিরেতার জলের মতই বিস্বাদ।

আমি উড়িষ্যার সেই স্পেশাল এক গ্লাস চা নিয়ে সবেমাত্র চুমুক দিয়েছি এমন সময় একটা ফিয়েট গাড়ী এসে সামনে দাঁড়াল।

একজন বছর ত্রিশ-এর সুদর্শন যুবক গাড়ী থেকে নেমে অত্যন্ত ভদ্রভাবে পরিস্কার হিন্দীতে আমার কাছে মুক্তি ঝা-র সন্ধান চাইল।

মুক্তি ঝা আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর শেল্‌ফ ড্রাইভার। কলকাতার অফিসে আমি তাকে প্রায়ই দেখি। খুবই ব্যস্ত ড্রাইভার। সারা বছর ধরে প্রায় প্রতি মাসেই কোন না কোন গাড়ী ডেলিভারি দিতে তাকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, আগরতলা, নেপাল, ভূটান, সিকিম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, দিল্লী, আসাম সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়। মাত্র চার ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা মুক্তি ঝা-র বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও উচ্চতায় সে এখনো একজন স্কুলের ছেলেকে পেরোতে পারে নি। ছোট-খাটো এই মানুষটি কনভয়ের বত্রিশ জন ড্রাই-ভারের মধ্যে মিশে গিয়ে প্রায় ছ'শো কিলোমিটার রাস্তা আমাদের সংগে পার হ'য়ে এল অথচ আজ দুপুরে আমি তাকে একবার মাত্র

লক্ষ্য করেছি। কেওনঝড়ে লাঞ্চ সেরে মিশ্রজীর ড্রাইভার চরণ শিংএর সংগে সে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

আমি গ্লাস নামিয়ে যুবকটির মুখের দিকে তাকালাম। তারপর গাড়ীর দিকে। একজন ভদ্রমহিলা ও একটি বছর তিনেকের বাচ্চা পেছনের সীটে ব'সে আছে। ভদ্রমহিলার পরণে চুমকী বসানো পাতলা শাড়ী। মাথায় সবুজ রঙের ভেল্।

এমন সময় যতিন মিস্ত্রীকে আমার দিকে আসতে দেখে আমি তাকে মুক্তি ঝা-কে ডেকে দিতে বললাম।

আমার চা শেষ হবার আগেই মুক্তি ঝা এসে হাজির হ'ল। আর তখনই আমি এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখলাম।

সুদর্শন যুবকটি প্রায় ছুটে গিয়ে মুক্তি ঝা-র পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল কিন্তু মুক্তি ঝা তাকে সে সুযোগ না দিয়ে দু'হাত ধরে সজোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তারপর বাচ্চা ছেলের মত দুজনেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

আমি হতভম্ব। মুক্তি ঝা-র পরণে অর্ডিনারি ড্রাইভারের ময়লা পোষাক। আর যুবকটির পরণে ঝক্‌ঝকে বিলেতী স্যুট।

কিছু বুঝে উঠবার আগেই গাড়ীর ভেতর থেকে বাচ্চাটিকে সংগে নিয়ে ভদ্রমহিলা নেমে আসছিল। মুক্তি ঝা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে হাসিমুখে বুকে চেপে ধরল। এই সময় ভদ্রমহিলা মুক্তি ঝা-র পা ছুঁয়ে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করল।

আমি মনে মনে ধারণা করলাম মুক্তি ঝা-র সংগে এদের কিছু একটা সম্পর্ক্য আছে। কিন্তু মুক্তি ঝা আর যুবকটি অমন ভাবে কেঁদে উঠল কেন?

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে মুক্তি ঝা আমার পাশে খাটিয়ায় ওদের বসতে বলল।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে উঠে দাঁড়াতেই মুক্তি ঝা আপত্তি করে বলল, আপনি বসুন বাবুজী। এরা আমার ভাই আর

বউ মা। পরে যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, ইন্‌কো প্রণাম কর জগদীশ।

আমি আপত্তি করার আগেই জগদীশ প্রণাম সেরে নিল।

চা আর বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে মুক্তি ঝা বাচ্ছা ছেলেটির জন্য বোধহয় কিছু খাবার-দাবার কিনতে গেল।

আমি জগদীশের সংগে আলাপ জমালাম।

কটকের একটি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক জগদীশ ঝা লণ্ডনের কলেজ অফ ইক্‌নমিকস্‌-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রায় এক বছরের ওপর দাদার সংগে জগদীশের সাক্ষাৎ নেই। আগে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা কলেজে অধ্যাপনা করত। তখন মাঝে মাঝে দেখা হ'ত। এখন কটকে চলে আসায় দেখা করার অসুবিধে। এবার কনভয়ে বেরুবার আগে মুক্তি ঝা চিঠি দিয়ে জগদীশকে জানিয়ে দিয়েছিল এই সম্বলপুরে নাইট হল্টের কথা। চিঠি পেয়ে জগদীশ ঠিক করল এখানেই দেখা করবে মুক্তি ঝা-র সংগে। কিন্তু আজ সকালে গাড়ীর ড্রাইভার জানাল তার শরীর অসুস্থ। সম্বলপুর যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অগত্যা দুটি সাদা বোর্ডে "L" মার্কা দিয়ে গাড়ীর সামনে পিছনে টাঙিয়ে অর্থনীতির এই অধ্যাপকটি বউ ছেলেকে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ল সম্বলপুরের উদ্দেশ্যে। কটক থেকে সম্বলপুর দু'শো একষট্টি কিলোমিটার রাস্তা। জগদীশ ঝা তার অপটু হাতে গাড়ী চালিয়ে গোটা পথ অতিক্রম করতে সময় নিয়েছে প্রায় ন'ঘণ্টা।

আমি জগদীশ ঝা-র মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, অল্প বয়স, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মনে মনে জগদীশের ভাতৃ প্রেমের তারিফ না করে পারলাম না। আর ভাবলাম মুক্তি ঝা-র কথা। ভাগ্য করে জন্মেছিল সে। নইলে এমন ভাই হাজারে একটাও মেলে না।

আজ মুক্তি ঝা-র রাতের খাওয়া মাথায় উঠে গেল। ভাইকে

নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এত রাতে অপটু হাতে গাড়ী চালিয়ে ভাইকে আর সে কটকে ফিরে যেতে দেয় নি। বত্রিশটা এ্যামবা-সাডারের সংগে জগদীশ ঝা তার ছোট্ট ফিয়েটকেও পেট্রোল পাম্পে গ্যারেজ করে দিল।

আজ আমার খেতে একটু দেরী হয়ে গেল। মুক্তি ঝা ছাড়ল না। ভাই আর বউমার সংগে আমাকেও জোর করে হোটেলে ধরে নিয়ে গেল।

তুপুরে কেওনঝড়ের হোটেলে খেতে বসে বাড়ীর রান্নার স্বাদ পেয়েছিলাম আর এখন সম্বলপুরের হোটেলে যেটুকু অতিরিক্ত পেলাম তা হ'ল মুক্তি ঝা-র বউ মা-র কাছ থেকে একেবারে ঘরের মত যত্ন।

পরের দিন সম্বলপুর থেকে রায়পুর যাবার পথে আমি ইচ্ছে করেই এই প্রথম গাড়ী বদল করলাম। অবশ্য আমার জিনিষপত্র সব ব্যানার্জীর গাড়ীতেই রইল। শুধু আমি একা মুক্তি ঝা-র পিছনের সিটে গিয়ে বসলাম।

আজ খুব ভোরে আমাদের গাড়ী ছাড়ার আগে জগদীশ তার বউ-ছেলেকে নিয়ে কটকের ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেছে। ওদের যাবার সময় মুক্তি ঝা আমাকে ডেকেছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপে আমি ওদের খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম। কটক কলেজের ঠিকানা দিয়ে জগদীশ একটিবার বেড়াতে যাবার জন্য আমায় বার বার অনুরোধ করল।

ওদের বিদায় দিতে গিয়ে মুক্তি ঝা-র মত আমারও চোখে জল এসে গেল।

গতকাল জগদীশ ঝা যখন প্রথম এল তখন তু'ভাই এর কান্না

দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তখন ওরা আমার কেউ ছিল না। আর এখন আমার নিজের চোখে জল দেখে ওরা দু'ভাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা বোধ হয় বুঝল না এখন ওরা আমার কত আপনজন।

গাড়ী সম্বলপুর থেকে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে।

জগদীশকে দেখার পর থেকে মুক্তি ঝা-র সম্পর্কে আমার কৌতূহল যেন আর বাধা মানতে চাইছে না। দু'ভাই-এর মধ্যে শিক্ষা আর পেশাগত যোগ্যতার এমন আশ্চর্য্য বৈসাদৃশ্য কেমন করে হ'ল তা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু আগের মত মুক্তি ঝা-কে আমি আর সামান্য একজন ড্রাইভার হিসেবে দেখতে পারলাম না। জগদীশ ঝা তাকে অনেক ওপরে তুলে দিয়ে গেছে। পাছে তার সম্মানে বাধে তাই অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার ড্রাইভারী জীবনের ইতিহাস শুনতে চাইলাম।

মুক্তি ঝা সজোরে ব্রেক কষলো। আমি চমকে উঠলাম। একটা ছাগলের বাচ্ছা রাস্তা পার হয়ে মার কাছে যেতে গিয়ে চাপা পড়েছিল আর কি।

মুক্তি ঝা নড়েচড়ে বসে গল্প সুরু করল ঃ

বিহারের পূর্ণিয়া জেলার রঘুগঞ্জ ষ্টেশনে নেমে এক মাইল পথ হাঁটলেই পথের ধারে দোতলা মাটির বাড়ীতে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে একটা ছোট সাইন বোর্ড সকলেরই নজরে পড়ত। তাতে লাল অক্ষরে বড় বড় করে লেখা থাকত, পণ্ডিত কুশন ঝা। জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষশাস্ত্রী।

সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত এই কুশন ঝা-র বড় ছেলে মুক্তির বয়স তখন তেরো বছর। তার আরও দুটি ছেলে আছে। মাঝের

বয়স চার আর ছোটটির বয়স সবেমাত্র একমাস। কুশনের ইচ্ছা ছিল তার বড় ছেলেকে নিজের থেকেও বড় পণ্ডিত ক'রে গড়ে তুলবে। কিন্তু সব আশাই ব্যর্থ হ'ল। অকাল-কুষ্মাণ্ড ছেলের পণ্ডিত হওয়ার চেয়ে মূর্খ হওয়ার দিকেই বেশী ঝোঁক দেখা দিল। স্কুল পালিয়ে, বই হারিয়ে, খাতা ছিঁড়ে মুক্তি ঝা তের বছর বয়সেই প্রমাণ করতে লাগল, শিক্ষাসাধনে মুক্তি—সে তার নয়।

ফলে বাড়ীতে ঢুকলেই অশান্তি, মারধোর, গালমন্দ। শেষে বাবারই বই বিক্রী ক'রে সেই পয়সা নিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে একেবারে রেলওয়ে স্টেশনে।

রঘুগঞ্জ নগর থেকে কাটিহার ষ্টেশনে ট্রেন এসে থামল। হাফ-প্যাণ্ট পরে তের বছরের বালক মুক্তি ঝা চোরের মত পা টিপে টিপে কলকাতা গামী একটা গাড়ীতে উঠতে যেতেই ধরা পড়ে গেল।

পাটের ব্যবসায়ী ভগবতী প্রসাদ বাঙ্কা সস্ত্রীক কলকাতায় ফিরছিল। সঙ্গে তার চারটি ছেলেমেয়ে আর মা সুন্দরী দেবী। সুন্দরী দেবী বিধবা। ভগবতী তার একমাত্র সন্তান। স্বামীর ছিল পাটের কারবার। কলকাতার ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিন্যু-এ তার বিরাট বাড়ী।

মুক্তি ঝা-কে সামনে বসিয়ে ভগবতী প্রসাদ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। আর মুক্তি ঝা গড়গড় করে একটির পর একটি মিথ্যে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। তার মা বাবা কেউ নেই। কাটিহারে একজনের বাড়ীতে চাকরের কাজ করত। তারা খুব মারধোর করে। তাই মুক্তি ঝা পালিয়ে যাচ্ছে।

সুন্দরী দেবীর মায়া হ'ল। আহা! এমন অনাথ ছেলেকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। কোথায় কি হবে। তারচেয়ে কলকাতায় তাদের বাড়ীতে রাখলেই হয়। এমন একটি ছেলে পেলে তাদেরও কাজের কত সুবিধে হয়।

অতএব চলো কলকাতায়।

হাওড়া ষ্টেশনে বাঙ্কা পরিবারকে নিয়ে যাবার জন্য মারাঠী যুবক কেশব একখানা বেডফোর্ড গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সকলে গাড়ীতে উঠে পড়ল। কেশব ষ্টার্ট দিতেই মুক্তি ঝা-র কথা মনে পড়ে গেল সুন্দরী দেবীর।

একটু দূরে বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুক্তি গাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে।

সুন্দরী দেবী ইসারা করে তাকে গাড়ীতে উঠতে বলল।

মুক্তি ঝা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভগবতী প্রসাদ গাড়ী থেকে নেমে হাতধরে টেনে এনে তাকে ড্রাইভার কেশবের পাশে বসিয়ে দিল।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিন্যু-এ বাঙ্কা পরিবারে চাকরী করতে এসে মহা ফাঁপরে পড়ে গেল মুক্তি ঝা। আজ দু-মাসের ওপর হয়ে গেল। সে শুধু খাচ্ছে আর বাড়ীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কাজই নেই তার।

একদিন সাহস করে গিন্নীমার ঘরে ঢুকে পড়ল সে। ঢুকেই থমকে গেল। ঘরময় শুধু ঠাকুর দেবতার ছড়াছড়ি। ধূপ-ধূনো আর ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। বালক মুক্তি ঝা-র দম আটকে যাবার যোগাড়।

কিন্তু ফিরে গেলে চলবে না। কাজ চাই তার। আর এ বাড়ীতে কাজ দেবার মালিক এই সুন্দরী দেবী। একেই মুক্তি ঝা চেনে। কাটিহার থেকে কলকাতা আসার পেছনে এই গিন্নীমাই তার একমাত্র আকর্ষণ।

চোখ বুজে গিন্নীমা বসেছিলেন। পায়ের শব্দে চোখ খুলে

মুক্তি ঝা-র দিকে তাকাতেই ফস্ করে সে কাজ চেয়ে বসলো।

গিন্নীমা মৃদু হাসলেন। তারপর সেদিন থেকে মুক্তি ঝা-কে বাইরে বেরুবার সময় সংগে করে নিয়ে চললেন।

মুক্তি ঝা-র কাজ শুরু হ'ল। মারাঠী ড্রাইভার কেশবের পাশে বসে গিন্নীমাকে সংগে নিয়ে দক্ষিনেশ্বর, আদ্যাপীঠ, পরেশ-নাথের মন্দির, কালীঘাট, তারকেশ্বর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দিন যায়। একদিন সুন্দরী দেবীর কেয়ারটেকার মুক্তি ঝা-র পদোন্নতি হ'ল। ভগবতীর ছেলেমেয়েদের সংগে করে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া। আবার ছুটি হ'লে বাড়ী আনা।

দেখতে দেখতে গাড়ীর ড্রাইভার কেশবের সংগে তার অন্তরঙ্গতা হ'ল। কথায় কথায় মুক্তি ঝা-র গৃহত্যাগের আসল কারণটা জেনে ফেলল কেশব। আর সেদিন থেকেই মুক্তি-র ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেল। মুক্তিরও ভাল লাগল কেশবকে। তার মনে হ'ল এই কেশবই তার সবচেয়ে আপনজন।

একদিন কেশবই নিজে মুক্তি ঝা-কে ড্রাইভারী শেখার পরামর্শ দিল। মুক্তি ঝা তখন কৈশোরে পা দিয়েছে। তার কিশোর মন ড্রাইভার কেশবের পাশে বসে বসে গাড়ীর গতির সংগে উড়ে উড়ে চলে যেতে চায়। সে স্বপ্ন দেখে, এমনি একটা গাড়ী। ড্রাইভারের আসনে মুক্তি ঝা নিজে। সামনে তার লম্বা পিচের রাস্তা।

প্রথমে গিন্নীমা রাজী হতে চাননি। এতটুকু ছেলে কোথায় কি করে বসবে।

মুক্তি ঝা দমে গেল।

শেষে কেশব গিয়ে গিন্নীমার অনুমতি আর ড্রাইভারী শেখার খরচ দুই-ই আদায় করে এনে একদিন ভগবতির ছেলে মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে মুক্তি ঝা-কে নিয়ে সোজা হাজির হ'ল শিয়ালদার মণ্ডল মোটর ট্রেনিং স্কুলে।

মণ্ডল স্কুলের একনম্বর ট্রেনার ছিলেন জীবনবাবু। বেগম-পুরের তাঁতির ছেলে জীবন মণ্ডল তখন কলকাতার সেরা ট্রেনিং মাষ্টার। মুক্তি ঝা-র অল্প বয়স দেখে জীবনবাবু তাকে নিজে হাতে করে গাড়ী চালাতে শেখালেন।

উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালে লাইসেন্স পেয়েই মুক্তি ঝা গাড়ী চালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ছোটখাটো এই ছেলেটির হাতে সাহস করে কেউ গাড়ী ছাড়তে রাজী হ'ল না। মহা সমস্যায় পড়া গেল। কাজ শিখেও চাকরী পাওয়া যাচ্ছে না। অগত্যা বাঙ্কা পরিবারের ড্রাইভারের চাকরিটা মুক্তি ঝা-কে দিয়ে কেশব ট্রান্সপোর্টের লরি চালাবার চাকরী নিয়ে অন্যত্র চলে গেল।

এরপর আরো পাঁচ বছর কেটে গেল। তেরো বছরের বালক মুক্তি ঝা এখন পরিপূর্ণ যুবক। ষ্টিয়ারিং-এ হাত দিলে ঝড়ের বেগে গাড়ী নিয়ে ছোটে। এখন রক্তে তার ছোটার নেশা। ফাঁক পেলেই সে গাড়ী নিয়ে শহরের বাইরে চলে যায়।

সুন্দরী দেবী সব লক্ষ্য করেন। তিনি বুঝতে পারেন কাটিহার ষ্টেশন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া পাখীর আজ পাখা গজিয়েছে। তাকে আর ধরে রাখা যাবে না। চাকরী ছেড়ে চলে যাবার সময় কেশব তাকে মুক্তি ঝা-র আসল পরিচয় জানিয়ে দিয়ে গেছে। সে বলেছে দেশে তার মা-বাবা আর ভাই-এরা আছে।

মায়া ত্যাগ করে সুন্দরী দেবী তাই একদিন মুক্তি ঝা-কে নিজের ঘরে ডেকে আনলেন। তারপর কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে বাড়ী ফিরে যেতে বললেন।

মুক্তি ঝা-র চঞ্চল রক্তের গতি যেন স্থির হয়ে গেল। যেন আসন্ন এক চির-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেল। সুন্দরী দেবীকে প্রণাম করে মুক্তি ঝা উঠে দাঁড়াল।

আর তাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে সুন্দরী দেবী মাটিতে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিলেন।

এই পর্য্যন্ত বলে মুক্তি ঝা থামল।

আমরা সারাইপালিতে এসে গেছি। ঘড়িতে দেখলাম এগারোটা পাঁচ। শিউশংকর মিশ্রের নির্দেশ মত আজ এখানেই লাঞ্চ হবে।

অতএব হল্ট্।

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। বেলা যত বাড়ছে আকাশের গোমরা মুখ ততই যেন আরও গোমরা হচ্ছে। গতকাল এমন দুপুরে রোদের তেজ ছিল প্রচণ্ড। অথচ সেই তুলনায় আজ কত ঠাণ্ডা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ী আবার ষ্টার্ট দিতেই গুড়িগুড়ি বৃষ্টি সুরু হ'ল। বছরের প্রথম বৃষ্টি। অনেক আকাঙ্ক্ষিত। হু হু করে বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা জোলো বাতাস। শরীর জুড়িয়ে যায়।

মুক্তি ঝা গাড়ী চালাচ্ছে। পথের দু-পাশের দৃশ্য সাঁ সাঁ করে পার হ'য়ে যাচ্ছে। দরজার কাঁচে মাথা রেখে বসে আছি। মন প'ড়ে আছে রঘুগঞ্জনগরের দোতলা মাটির বাড়ীটির দিকে।

মুক্তি ঝা চুপচাপ গাড়ী চালাচ্ছে। লুকিং গ্লাসে তার অকম্পিত চোখের তারা দেখে বুঝতে পারছি তার মনও আমার মত কুশন ঝা-র দোতলা মাটির বাড়ীটি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রায় দশ বছর পর মুক্তি ঝা বাড়ী ফিরল। কিন্তু কই? কোথায় কুশন ঝা? কোথায় তার দোতলা বাড়ী? আর কোথায়ই বা জ্যোতিষশাস্ত্রী মার্কা তার নেম প্লেটটা? না। কিছুই নেই। দোতলার ওপরতলা ভেঙে গেছে। আর মেরামত করা হয় নি। নিজের নামের সমস্ত অহংকার চূর্ণ হয়ে গেছে। তাই কুশন ঝা

নিজেই নেম প্লেট খুলে নিয়েছে। মুক্তি ঝা-র শোকে তার মা পাগলের মত হ'য়ে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। দুটো ভাই পাড়ার বকাটে ছেলের সংগে মিশে ছড়্ খেয়ে গেছে। আর স্বয়ং কুশন ঝা শোকে দুঃখে ক্ষোভে অপমানে আর হতাশায় কপর্দক শূন্য হয়ে স্ত্রীর শয্যা-পার্শ্বে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। তার খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, আশা নেই, স্বপ্ন নেই, এমন কি বেঁচে থাকার স্পৃহাটুকুও নেই। তবু সে বেঁচে আছে। মৃতপ্রায় স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখার জন্য সে আজও বেঁচে আছে।

মুক্তি ঝা অথৈ সাগরে পড়ল। সে বাড়ীর বড় ছেলে। দশ বছরের জমানো নৈতিক দায়িত্বগুলো তাকে এক এক ক'রে পালন করতে হবে। নইলে মা বাঁচবে না, বাবার সম্মান থাকবে না। ভাইদুটো মানুষ হবে না।

একেবারে কোমর বেঁধে লেগে গেল মুক্তি ঝা। তার পাঁচ বছরের চাকুরী জীবনের সঞ্চিত অর্থ আর সুন্দরী দেবীর দেওয়া টাকা দিয়ে মাকে নিয়ে চলল যমে-মানুষে টানাটানি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মুক্তি ঝা-র। দীর্ঘ সাতমাস প্রাণপণ সেবা আর সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থব্যয় করেও মাকে বাঁচাতে পারল না সে।

এই প্রথম মুক্তি ঝা-র অন্তর হাহাকার করে উঠল। মা-র এই অকালমৃত্যুর জন্য মনে মনে সে নিজেকেই দায়ী করল। মনে হল, রঘুগঞ্জের বদ্ধ হাওয়ায় সে বুঝি কোনদিন মুক্তির শ্বাস টানতে পারবে না। তাই সবকিছু ছেড়ে চিরকালের জন্য আবার সে কলকাতায় ফিরে যাবে। কিন্তু না। সে পারল না। কুশন ঝা-র অস্বাভাবিক মৌনতা, তার বোবা চোখের ছলছল অসহায় দৃষ্টি চুম্বকের মত মুক্তি ঝা-কে তার নিজের দিকে টেনে রাখল।

একটা ভূমিকম্পে একদিক ভাঙ্গে আবার অন্যদিক গড়ে। কুশন ঝা-র সংসারে যে ভূমিকম্প হ'ল তাতে তার স্ত্রী মারা গেল। অন্য-

দিকে মুক্তি ঝা ফিরে এল।

সুরু হ'ল আবার গড়ার পালা।

মুক্তি ঝা আবার থামল। বৃষ্টিটা জোরে এল। ড্রাইভারের সামনের কাঁচের ওয়াইপার চালিয়ে একটা লাল ঝাড়ন দিয়ে গাড়ীর ভেতরের কাঁচটা মুছে দিল মুক্তি ঝা। বাতাসের বেগ বাড়ল। দরজার নামানো কাঁচের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে আমার চোখে মুখে লাগছে।

আমাদের সামনের গাড়ীর ড্রাইভার ভ্রমর শিং তার ডানহাত বাড়িয়ে গতিসীমা কমিয়ে আনার ইংগিত করল।

মুক্তি ঝা গাড়ীর গতি কমিয়ে আনল। মসৃণ পিচের রাস্তা বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। জোরে চালালে গাড়ী স্লিপ্ করতে পারে।

সামনেই ছোট একটা বাঁকের মুখেই আবার আমাদের গাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। কি ব্যাপার! একজন লম্বা চওড়া জোয়ান পাঞ্জাবী আর অপর একজন খালাসি গোছের লোককে দেখলাম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিশ্রজীর সংগে কি সব কথাবার্তা বলছে।

একটু পরেই মিশ্রজীর গাড়ীর ড্রাইভার চরণ সিং একটা পলি-থিনের চাদর গায়ে জড়িয়ে খালাসি গোছের লোকটার সংগে বাঁক পেরিয়ে অদৃশ্য হ'ল।

আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। পাঞ্জাবীটা এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে।

মিনিট দুই পরেই চরণ সিং ফিরে এ'ল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিশ্রজীকে কি বলল। তারপরেই দেখলাম মিশ্রজীর ইংগীতে লিডিংকার নন্দলালের গাড়ীতে লোক দুজনকে তুলে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

এক এক করে আমাদের গাড়ীও নড়ে উঠল।

সামনের বাঁক পেরিয়েই রাস্তা থেকে একটু ধারে ছোট একটা পুকুরের মাঝখানে দেখি দৈত্যাকার একটা ট্রান্সপোর্টের লরি একেবারে উল্‌টে গেছে। লরির সব ক'টি চাকাই ওপর দিকে। বুঝলাম, নন্দলালের গাড়ীর আরোহী পাঞ্জাবীটি নিশ্চয়ই এ গাড়ীর ড্রাইভার। আর সংগের লোকটি তার সাথী হবে হয়তো।

লরিটির চাবিধার কাঠের উঁচু ডালা দিয়ে ঘেরা। একপাশের ডালা ভেঙে খুলে গেছে। ভেতরে ঠাসা ছাগলের দল এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কিছু মৃত ছাগল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি চরে চরে ঘাস খাচ্ছে। আর বাকিগুলো লরির ভেতর গাদাগাদি করা। আশ্চর্যের বিষয়। লরিভর্তি এত ছাগল। অথচ একটি ছাগলকেও ডাকতে দেখলাম না। মনে হ'ল ভয়ংকর এ বিপদের মধ্যে পড়ে তাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে।

আমি মুক্তি ঝা-কে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে এমন এ্যাক্সিডেন্ট হ'ল ?

মুক্তি ঝা বলল, কি জানি বাবু। কিছু বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে ব্রেক ফেল করেছে। ,কিংবা বাঁকের মুখে জোরে আসতে গিয়ে চাকা স্লিপ করেও হতে পারে।

আমি বললাম, ঐ পাঞ্জাবীটি বোধ হয় লরির ড্রাইভার।

মুক্তি ঝা বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—আচ্ছা, এরকম এ্যাক্সিডেণ্টে ড্রাইভার বাঁচল কি করে ?

মুক্তি উত্তর দিল, বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না বাবু। এখানেই আমরা ভাগ্যকে মানতে বাধ্য হই। তাছাড়া এ্যাক্সিডেন্ট হবার আগে আমরা যেন টের পেয়ে যাই। আর মুহূর্তে ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় আমাদের সজাগ করে দেয়। তারপর কেমন করে যেন আমরা বেঁচে যাই।

স্কুলের বই-এ পড়া রবার্ট হাক্সলির সেই বিখ্যাত ইংরাজী

উক্তিটুকু আমার মনে পড়ে যায়, 'চান্‌স্‌ এ্যাণ্ড এ্যাক্সিডেণ্ট আর ওনলি এ্যালাইশেশ অব ইগ্‌নরেন্‌স্‌।'

কিছু দূর এগিয়ে আর একটা বাঁক। সামনেই লাল সাইনবোর্ডে হিন্দীতে লেখা, 'এইসা মত চলো যো কভি না পৌঁছো।'

তখন বিকেল সাড়ে চারটে। অন্যদিন এমন সময় পড়ন্ত রোদের আভায় প্রকৃতি ঝলমল করে। আজ সেই প্রকৃতির বুকে অসময়ে অন্ধকার নেমেছে। বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই বাড়ছে। তার সংগে বাতাসের তীব্রতা। রাস্তা দেখে গাড়ী চালাতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে! কোন কোন জায়গায় বেশ জল জমে গেছে। অগত্যা গাড়ীর হেড লাইট জ্বালাতে হ'ল।

মিনিট পঁচিশের মধ্যেই আমরা আবার একজায়গায় এসে দাঁড়ালাম। গাড়ীর দু'পাশে বন্ধ কাঁচের গা বেয়ে হু হু ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে। বাহিরের দৃশ্য ঠিকমত বুঝতে পারছি না।

আমি মুক্তি ঝা-কে প্রশ্ন করলাম, আমরা কোথায় এলাম?

মুক্তি ঝা হাতের চেটো দিয়ে কাঁচটাকে মুছে বাইরে তাকিয়ে বলল, রায়পুর।

অবশেষে রায়পুর এসে গেলাম। কলকাতার অফিসে বসে এই রায়পুরের কথা অনেকবার শুনেছি। শুনেছি কলকাতা থেকে বোম্বাই যাবার পথে এই রায়পুরই নাকি সবচেয়ে বড় হল্টেজ। মোটামুটি একুশ শো কিলোমিটার পথের মাঝামঝি জায়গা এটা। আগে আগে এখানে কনভয়ের গাড়ীর সার্ভিস হ'ত।

প্রায় তিনঘণ্টা পর অর্থাৎ রাত আটটায় বৃষ্টি থামল।

এতক্ষণ গাড়ীর মধ্যে বসে বসে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। বৃষ্টি থামতেই দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

ড্রাইভাররাও এতক্ষণ বৃষ্টির জন্য আটকে ছিল। এবার এক এক করে সবাই মিশ্রজীর কাছে হাজির হ'ল।

কলকাতা থেকে গাড়ী ছাড়ার পর বোম্বে রোডের পেট্রোল পাম্পে ড্রাইভারদের প্রথম হাতখরচ দেওয়া হয়েছিল। এবার সেকেণ্ড পেমেণ্ট। আবার হাতখরচ। পরিমাণ সেই পঁচিশ টাকা। ড্রাইভারদের মধ্যে ব্যস্ততা। একটু হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এবার মিশ্রজী নিজেই এক এক করে সকলের হাতে টাকা দিলেন।

আমি এতক্ষণ মিশ্রজীর কাছেই ছিলাম। চরণ সিং-কে দেখলাম ক্ষিপ্র হাতে পেট্রোল পাম্পের একধারে একখানা ছোট চালায় গাড়ী থেকে মিশ্রজীব পোঁটলা পুটলি নামাচ্ছে। তার সঙ্গে নন্দলালও হাত লাগিয়েছে। বুঝলাম না কিসের এত ব্যস্ততা।

ব্যানার্জীকে দেখলাম গামছা কাঁধে। বোধ হয় চান করতে যাচ্ছে।

আমি আজ আর চান করব না। এত বৃষ্টির পর কেমন শীত শীত লাগছে।

এক কাপ চা খাবার উদ্দেশ্যে কাছাকাছি কোন দোকানে যাবার জন্য পা বাড়ালাম। পেছন থেকে মিশ্রজী ডাকলেন, দাসবাবু শুনুন।

আমি মিশ্রজীর দিকে এগিয়ে গেলাম।

শিউশংকরবাবু বললেন, আজ রাতে আমি খানা বানাব। ডালপুরি আর মাংস। আপনার নিমন্ত্রণ রইল। রাতে চরণ সিং ডেকে আনবে।

আমি একটু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিশ্রজীর দিকে তাকালাম।

সার্দুল সিং এসে খবর দিল কলকাতা থেকে বাজোরিয়া সাহেবের ট্রাঙ্ককল এসেছে।

মিশ্রজী টাকার ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর পাম্পের অফিস ঘরের দিকে চললেন।

বাজোরিয়ার ট্রাঙ্ককলের কথা শুনে আবার পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

রেঙ্গুন থেকে বার বার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও রামনন্দন যখন দেখল যে রামকিশনের রেঙ্গুন ফেরার কোন লক্ষণই নেই তখন একদিন সে নিজেই কলকাতার পথে রওনা হ'ল।

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। রেঙ্গুনের মানি লেণ্ডার রামনন্দন বাজোরিয়া কলকাতার মটর ব্যবসায়ী বাসুদেব আগর-ওয়ালার কাছে বুদ্ধির খেলায় হেরে গেল। রামনন্দনের একমাত্র পুত্রটিকে ছিনিয়ে নিয়ে বাসুদেব তার চতুর্থ কন্যাটিকে তার হাতে তুলে দিল।

সব শুনে রামনন্দন বাজোরিয়া ক্ষেপে লাল হয়ে গেল। তার রাজপুত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠল। সে রাণা প্রতাপের বংশধর। অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবকিছুর চেয়ে তার কাছে বড় আত্ম-সম্মান। সেই আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে তার। সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে বাসুদেব আগরওয়ালা মুনিয়া বংশজাত। সামাজিক স্তরে অনেক নীচে স্থান। সে কিনা রামনন্দনের মত রাজপুত বংশজাতের ছেলের সংগে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলে। বংশ মর্যাদায় দারুণ ঘা লাগল রামনন্দনের।

সবচেয়ে রাগ হ'ল নিজের ছেলের ওপর। একমাত্র ছেলে তার। কত আশা ছিল রামনন্দনের।

একবার সে ভাবল ছেলের মুখদর্শন করবে না আর। কিন্তু স্ত্রীর কান্নাকাটিতে রামকিশনকে সে সোজাসুজি বুঝিয়ে দিল যে আগর-ওয়ালার মেয়েকে ত্যাগ করে তাকে এখুনি রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু রামকিশন তখন এক ত্রিভূজাকৃতি জালের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। সে জালের একদিকে শিউশংকর মিশ্র আর একদিকে সন্ত বিবাহীতা স্ত্রী অন্যদিকে স্বয়ং বাসুদেব আগরওয়ালা।

অবশেষে কলকাতারই জয় হ'ল। একমাত্র সন্তানকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করে রামনন্দন বাজোরিয়া তার স্ত্রীকে নিয়ে রেঙ্গুনে ফিরে গেল।

সেদিন থেকে শিউশংকর মিশ্রই রামকিশনের সব। আজ আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী যে এতবড় হতে পেরেছে তার মূলে কিন্তু মিশ্রজীই। অবশ্য বাসুদেব আগরওয়ালার মত শ্বশুরের সাহায্য না পেলে হয়ত রামকিশনের এতবড় হ'তে অনেক সময় লাগত। তবে আগরওয়ালা সাহেব উপযাচক হয়েই তো তাকে জামাই করেছে। অতএব জামাইকে দাঁড় করানো তার একরকম দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। তবে সে কেন রামকিশনকে সাহায্য করবে না। কিন্তু শিউশংকর মিশ্রের অন্য অভিসন্ধি ছিল। রামকিশনকে জড়িয়ে সে নিজেও ওপরে উঠতে চেয়েছিল। তার অর্থ ছিল না বটে, কিন্তু সে তার নিজের বুদ্ধি, পরিশ্রম আর বিশ্বাসের সবটুকু দিয়েই রামকিশনকে সাহায্য করেছে।

অন্যদিকে রামকিশন যে কলকাতা ছেড়ে রেঙ্গুন গেলো না তার অন্যতম কারণ এই মিশ্রজী। বয়সে বেশ কিছু বড় এই শিউশংকর মিশ্রকে প্রথম দেখার পর থেকেই তার ওপর একটা আকর্ষণ অনুভব করতে থাকল রামকিশন। মিশ্রের চমৎকার বুদ্ধিমত্তা, তার ব্যবসা-সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বাসুদেব আগরওয়ালার মত ধনী ব্যবসায়ীদের সংগে যোগাযোগ, সবার ওপর প্রতিটি কাজে আন্তরিকতার সন্ধান পেয়ে রামকিশন একরকম অন্ধের মতই তাকে অনুসরণ করতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই সে তার ফলও পেতে থাকল। একটু অলস প্রকৃতির বেহিসেবি রামকিশন বিনা পরিশ্রমে কেবলমাত্র কিছু অর্থ বিনিয়োগ ক'রে একরকম শিউশংকরের ঘাড়ে বসেই

ঠিকাদারীর লাভের পয়সা পকেটে পুরতে থাকল। কিন্তু সঞ্চয়ী হওয়া তার স্বভাব বিরুদ্ধ। রেঙ্গুনের মিস্ত্রী পল্লীতেই অল্প বয়স থেকে গোপনে গোপনে সে একটা নেশার শিকার হয়ে পড়েছিল। কলকাতায় একা হতেই সেই নেশা তাকে পুরোপুরি গ্রাস করল। বছর তিন-চারেকের মধ্যেই কলকাতার জনপ্রিয় কয়েকটি হোটেল আর রেষ্টুরেণ্টের বারে বারে রামকিশন একজন অতি পরিচিত খরিদ্দার হয়ে উঠল। আঠাশ বছরের যুবক মদের গ্লাস হাতে এই বয়সেই অনেক বয়স্ক লোকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে তাদের নেশাগ্রস্থ চোখ-গুলোকে কপালে তুলে দিত।

বাসুদেব আগরওয়ালা সব জানত। কলকাতার একনম্বর ঝানু ব্যবসায়ী সে। বিচক্ষণতায় তার জুড়ি মেলা ভার। রামকিশনের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর যোগাড় করতে তাকে একটুও বেগ পেতে হয় নি। তবুও সব জেনেশুনেই সে তারই হাতে তার ছোট মেয়েকে তুলে দিয়েছিল।

শিউশংকর মিশ্র কিন্তু এতটা আশা করে নি। আগরওয়ালার ছোট মেয়েকে সে দেখেছে। চার-চারটি মেয়ে তার। কিন্তু একটিকেও সুশ্রী বলা চলে না। রামনন্দন বাজোরিয়া শুধুমাত্র নুনিয়া জাতের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলেই তার একমাত্র পুত্রকে একরকম তাজ্যপুত্রই করে দিলে। তবু সে তার পুত্রবধূকে দেখে নি। যদি দেখত তাহলে হয়ত রামকিশনকে সে খুন করতেও কুণ্ঠিত হ'ত না।

আজ রামকিশনের বিয়ের জন্য পরোক্ষভাবে নিজেকেই শিউশংকর দায়ী বলে মনে করে। যদিও রামকিশন তাকে কোনদিনই বিয়ের ব্যাপারে কোন কিছুই বলে নি। তবু শিউশংকর বুঝতে পারে, ঠিকাদারের সুযোগ দিয়ে রামকিশনকে বাসুদেব একরকম কিনেই নিয়েছে।

সেই রামকিশন বাজোরিয়ার মাথায় এখন টাক পড়েছে।

আজ তাকে দেখলে কেউ বলবে না যে এই লোকটাই একদিন বাসুদেব আগরওয়ালার মত লোকের চোখেও হ্যাণ্ডশাম হয়ে ফুটে উঠেছিল। তার অমন উজ্জ্বল চেহারা শুকিয়ে কালিবর্ণ হয়ে গেছে। এই বয়সেই সে যথেষ্ট বুড়িয়ে গেছে। এখন তার থেকেও অন্ততঃ বারো বছরের বড় শিউশংকর মিশ্র কিন্তু অনেক শক্ত। এই বয়সেও শিউশংকর প্রায় যুবকের মতই পরিশ্রম করে।

শিউশংকর মিশ্র একজন মার্কামারা কনভয় ইনচার্জ। এ লাইনে সব ব্যবসাদারই তাকে চেনে। তাদের অনেকেই সময়ে অসময়ে শিউশংকরকে ভাল ভাল অফার দেয়। কনট্যাক্ট বেসিসে মাঝে মাঝে সে অফার যে শিউশংকর গ্রহণ করে না তা নয়। তবে বাজোরিয়া কোম্পানীর সংগে তার বরাবরের চুক্তি। কোম্পানী কখনও শিউশংকর মিশ্র ছাড়া অন্য কাউকে কনভয় ইনচার্জ এর পদে নিয়োগ করতে পারবে না যতক্ষণ না মিশ্র নিজে এ পদে কাজ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। অবশ্য এসব চুক্তির কথা কাগজে-কলমেই আছে। বাজোরিয়া কখনও ভাবে না যে আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর কনভয় ইনচার্জ শিউশংকর মিশ্র ছাড়া আর কেউ হতে পারে। আর মিশ্রজীও কখনও বাজোরিয়ার কোম্পানীর স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেয় না।

মিশ্রজী একটু দ্রুতপদেই পেট্রোল পাম্পের অফিস ঘরে ঢুকল। এবার বাজোরিয়া সাহেবের সংগে শিউশংকরকে বেশ চিৎকার করে কথা বলতে হবে। নইলে কলকাতায় বসে রামকিশন কিছুই শুনতে পাবে না।

আমি চা-এর দোকানে এসে ঢুকলাম। পেট্রোল পাম্পের সামনেই দোকান। বৃষ্টিতে পাম্পের ভেতরের জমা জল রাস্তায়

এখনও গড়িয়ে আসছে। ময়লা জলের ওপর পেট্রোল ভাসছে। কেমন একটা তেল-তেল গন্ধে চারিদিক ভরে আছে।

এরই মধ্যে ছোট্ট দোকানে বেশ ভীড় জমে গেছে। অনেকক্ষণ বৃষ্টির পর গরম চা-এর চাহিদা বেড়েছে। দোকানের বাইরে খান তিনেক বেঞ্চ পাতা। সামনেটা বেশ আলো হয়ে আছে। অথচ দোকানের ভেতরটা কেমন আবছা অন্ধকার। একটা ময়লা পর্দা ঝুলছে ভেতরে। মনে হচ্ছে পর্দা ফেলে দোকানটা দুটো ভাগ করা হয়েছে। ভেতরের ভাগে পর্দার ফাঁক দিয়ে কয়েক জন মানুষের পা দেখতে পাচ্ছি। বোধ হয় সেখানে কেবিনের ম'ত ব্যবস্থা আছে। তবে চা-এর দোকনেও কেবিন, সে বোধহয় শুধু কলকাতাতেই সম্ভব। কিন্তু এখানেও দেখছি। দেখে অবাক হচ্ছি।

উইলশনকে দেখলাম টাকা গুনতে গুনতে বেঞ্চের কাছে এসে দাঁড়াল। পরিষ্কার আলোয় ওর হাতে পাঁচটি পাঁচ টাকার নোট দেখলাম। বুঝলাম, সেকেণ্ড পেমেণ্ট।

কনভয়ে এই ড্রাইভারস্ পেমেণ্ট একটা মজার জিনিষ। কলকাতায় বসে এই বিশেষ কাজটুকুর যতটুকু করা হয় তার জন্যই আমি বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়েছি। যদিও আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্প্যা-নীতে আমার প্রধান কাজ এ্যাকাউণ্ট সংক্রান্ত কাজের তদারক করা। কোম্প্যানী সারা বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কখনও কখনও ভারতের বাইরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতেও বিভিন্ন ধরণের গাড়ী, চেসিজ ইত্যাদি ডেলিভারি দেয়। এক এক জায়গার জন্য ড্রাইভাররা এক এক রকমের পেমেণ্ট পায়।

সাধারণতঃ কনভয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি গাড়ী পিছু ড্রাইভারেরা প্রতি কিলোমিটারে পায় পনের পয়সা। আর চেসিজের বেলায় কিলোমিটারে কুড়ি পয়সা। তবে জায়গার দূরত্ব অনুসারে ড্রাইভারদের প্রাপ্য প্রায় মোটামুটি একটা ঠিক করাই থাকে। যেমন, কলকাতা থেকে বোম্বাই। মোট একুশশো কিলোমিটারের জন্য

চারশো বারো টাকা। আবার টাটা থেকে আগরতলার মোট দূরত্ব অনুযায়ী ছ'শো বিরানব্বই টাকা। পেমেণ্টের ক্ষেত্রে সব সময় পথের দূরত্বটাই আবার সব নয়। পথের অবস্থার কথাটাও চিন্তা করতে হয়। সমতল পথের চেয়ে বিপজ্জনক পাহাড়ী পথে গাড়ী চালানোর দায়িত্ব অনেক বেশী। তাই ড্রাইভারদের প্রাপ্যও সে ক্ষেত্রে বেশী হয়।

চা খেয়ে আবার পাম্পের ভেতর এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ একটি ছেলেকে হন্তদন্ত হয়ে দ্রুত আমার দিকে আসতে দেখলাম।

ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। রাস্তা থেকে নন্দলালের গাড়ীতে করে এই ছেলেটিই সেই পাঞ্জাবী ড্রাইভারের সংগে এই পেট্রোল পাম্পে এসে উঠেছে। কিন্তু অমন হন্তদন্ত হয়ে চলল কোথায়?

আমাকে পেরিয়ে ছেলেটি রাস্তা ধরে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

তারপরেই একটা সোরগোল শুনতে পেলাম। কয়েকটি গাড়ীর আড়ালে একটা খাটিয়া ঘিরে কয়েকজন ড্রাইভার কি একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ ব্যস্তভাবে আলোচনা করছে।

আমি কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই দেখলাম খাটিয়ায় সেই জোয়ান পাঞ্জাবীটি শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে। তার লম্বা-চওড়া চেহারা খাটিয়া ছাপিয়ে অনেকটা বাইরে বেরিয়ে আছে।

রামকুমারকে দেখলাম। পাঞ্জাবীটির বাম দিকের বুকে ম্যাসাজ করে দিচ্ছে।

রামকুমার এক সময় মিলিটারিতে ছিল। এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে ভারতের যুদ্ধের সময় পার্বত্য এলাকার এক সেনানিবাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সে। সৈনিকের শক্ত চেহারা তার। তবু এই পাঞ্জাবীটির কাছে যেন কিছুই নয়।

পাঞ্জাবীটির ঝুঁটি বাঁধা লম্বা চুল খুলে গেছে। দূর থেকে আচমকা দেখলে মেয়েদের চুল বলে ভুল হয়। লম্বায় ছ'ফুটের

ওপর পাঞ্জাবীটির দাড়ি গোঁফ নেই বললেই চলে। সন্থ দাড়ি কামানোর জন্যই হোক আর অন্য যে কোন কারণেই হোক দাড়ি গোঁফ হীন পাঞ্জাবী দেখতে ভাল লাগে না। কেমন নেড়া নেড়া লাগে।

রামকুমার পাঞ্জাবীটিকে উপুড় করে শুইয়ে দিলে। তারপর ভ্রমর সিং-কে একটা বালিশ আনতে বলে তার ভিজে জামা-কাপড় খুলে দিতে লাগল।

নন্দলাল মিশ্রজীর গাড়ী থেকে মালপত্র নামিয়ে খাটিয়ার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাড়াতাড়ি রামকুমারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার সেই দুপুর থেকে বৃষ্টিতে ভিজছে। জামা-কাপড় ভিজে স্যাঁতস্যাঁত করছে। একটা চেক চেক লুঙ্গির ওপর কচি কলাপাতা রঙের মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবী দেহের সংগে লেপ্টে ছিল। একটু আগে বেশ ছটপট করছিল। এখন যেন অনেকটা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। রামকুমার উপুড় করে শুইয়ে দিতে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে অবশ হয়ে পড়ে রইল।

ভ্রমর সিং মিশ্রজীর একটা পাম্প দেওয়া বালিশ চেয়ে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে ফোলাতে রামকুমারের হাতে দিল।

রামকুমার সেটা লোকটির বুকের নীচে দিয়ে বুকের অংশ একটু উঁচু করে দিল। তারপর লোকটির একপাশে মাথার দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে নিজের গোড়ালীর উপর চেপে বসতে গেল। কিন্তু ছোট খাটিয়ায় একজন লোকই ভালভাবে শুতে পারছে না। তার ওপর রামকুমারের দশাসই চেহারার আধখানাও ধরল না।

অগত্যা অপর একটা খাটিয়া এনে জোড় দেওয়া হ'ল।

রামকুমার হাতের কনুই না বেঁকিয়ে হাঁটুগাড়া অবস্থায় গোড়ালি থেকে সরে সোজা হয়ে নিজের শরীরটাকে আপন হাতের ওপর নিয়ে এল।

পাঞ্জাবী ড্রাইভারের তেজী কোমর রামকুমারের শরীরের ভারে বসে গেল। রামকুমার আবার আগের মত গোড়ালির ওপর চাপ দিয়ে বসল।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার দিকে তেমন কারো নজরও নেই। সকলেই ড্রাইভারটিকে নিয়েই ব্যস্ত।

আমার মনে পড়ল সারাইপালি থেকে কিছুদূর আসার পরই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার ধারে ছোট একটা পুকুরের মাঝখানে ছাগলভর্তি লরিটার এ্যাক্সিডেন্টের কথা। এই ড্রাইভার সেই লরিটার।

এতক্ষণে ব্যাপারটা তলিয়ে ভাববার সুযোগ পেলাম যেন। আর ভাবতে গিয়েই অবাক হলাম।

লরিটার ছবিটা চোখের সামনে ভাসছে। একেবারে উল্টে গেছে। ড্রাইভারের সামনের দিকটা জলের ভেতর পাঁকে গেঁথে গেছে। অথচ সেই লরির ড্রাইভার দিব্যি অক্ষত দেহে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিশ্রজীর সংগে কি সব কথাবার্তা বলে নন্দলালের গাড়ীতে চেপে রায়পুর চলে এল।

সে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। অথচ রাস্তায় আসতে আসতে এ সবের কিছুই টের পাই নি। বুঝলাম, ড্রাইভার অলৌকিক-ভাবে রক্ষা পেয়েছে। তবে নিশ্চয়ই কোথাও জোর লেগেছে। নইলে এতক্ষণ পর এভাবে কষ্ট পাবে কেন?

প্রায় মিনিট তিনেক সময় কাটল। এরই মধ্যে রামকুমার গুণে গুণে ছত্রিশ বার লোকটির শরীরের ওপর নিজের দেহের ভার কমিয়ে বাড়িয়ে সোজা হয়ে বসতেই ড্রাইভারটি হঠাৎ মুখ তুলে সামান্য বমি করল।

আমি আস্বস্ত হলাম। লোকটির অবস্থা দেখে মনে হ'য়েছিল বুঝি মারা গেছে।

সেই খালাসি গোছের ছেলেটিকে দেখলাম কাঁচের গ্লাসে গরম দুধ নিয়ে ব্যস্তভাবে খাটিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

নন্দলাল তাড়াতাড়ি লোকটির হাত থেকে দুধ নিয়ে বোধহয় খাওয়াতে যাচ্ছিল।

রামকুমার বাধা দিয়ে বলল, আভি নেহি।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। রামকুমার একইভাবে লোকটির শুশ্রূষা করে যাচ্ছে।

একসময় লোকটি নিজে থেকেই কাত হয়ে হাত পা গুটিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

রামকুমার জোর করে আবার তাকে উপুড় করে শোয়াতে যেতেই অনেকেই আগে একটু গরম দুধ খাওয়াবার পরামর্শ দিতে লাগল।

কিন্তু রামকুমার নাছোড়বান্দা। তার চোখে-মুখে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব। দেখে মনে হ'ল এই প্রক্রিয়ায় সে যথেষ্ট আশার আলো দেখতে পেয়েছে।

লোকটিকে আবার উপুড় করিয়ে রামকুমার আগের মতই মেরু-দণ্ডের দু-পাশে দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরল।

লোকটি আবার ওয়াক্ করে উঠল। ঠিক বমি হ'ল না। সামান্য একটু জল উঠলো।

বাজোরিয়া সাহেবের সংগে কথা বলে মিশ্রজী একটু দ্রুতপায়েই খাটিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। পেছনে পেছনে যতিন মিস্ত্রী।

মনে হল, যতিন মিস্ত্রীই বোধহয় মিশ্রজীকে খবর দিয়েছে।

মিশ্রজীকে দেখে সবাই একটু নড়ে চড়ে উঠল।

শুধু রামকুমারেরই কোন ব্যতিক্রম হ'ল না। একজন ট্রেণ্ড সৈনিকের মতই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে একই ভাবে হাঁটু গেড়ে ব'সে রইল।

মিশ্রজী জিজ্ঞেস করল, কেয়া হুয়া ?

রামকুমার বলল, থোড়া সে পানি পি লিয়া।

যতিন মিস্ত্রী বলল, একজন ডাক্তার ডাকলেই তো হয়। যদি বুকে পিঠে কোথাও লেগে থাকে।

মিশ্রজীর কথাটা মনঃপুত হ'ল। বলল, হাঁ হাঁ, বোলাও না ডক্টর।

যতিন এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

সেই খালাসি গোছের ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ম্যায় লে আয়ুঙ্গী ?

মিশ্রজী অর্ডার দেবার আগেই রামকুমার লোকটিকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বলল, ঘাবড়াও মত্। জাদা কুছ নেই হুয়া। সব ঠিক হো যায়গা। এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে নন্দলালকে বলল, থোড়াসে দুধ পিলাও।

নন্দলাল গ্লাস হাতে খাটিয়ায় গিয়ে বসল।

রামকুমার উঠেই সামনে আমায় দেখে বলল, বাবুজী, ম্যায় ফাষ্ট-এড্ দে দিয়া। মালুম হোতা কি ঠিক হো যায়গা ?

আমি বললাম, তবু মিশ্রজী যখন বলছেন তখন একবার ডাক্তার দেখিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।

রামকুমার বলল, হাঁ হাঁ ও তো ঠিক হ্যায়।

বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। কিন্তু আকাশে মেঘ এখনো কাটে নি। যে কোন মুহূর্তে আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

আমি আবার পাম্প ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

উইলশন তখনও চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখে মাথাটা সামান্য কাত করে ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে পা দুটো জোড়া করে সুন্দর ভঙ্গিতে আমায় স্যালুট করল। তারপর পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করল এখন আমার কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা।

আমি ঘড়ি দেখলাম। প্রায় সাড়ে আটটা। বললাম, রাত দশটা নাগাদ মিশ্রজী নিমন্ত্রণ করেছেন। ডালপুরি আর মুরগীর মাংস। আর কোন প্রোগ্রাম নেই।

উইলশন বলল, যদি আপত্তি না থাকে তাহলে চলুন আমার বাড়ীতে আপনাকে একটু ঘুরিয়ে আনি।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমার চাকুরী জীবনের দু'বছরই উইলশনকে বরাবর কলকাতাতেই দেখছি। আমি তো জানি সে কলকাতাতেই থাকে। যতদূর মনে পড়ছে, ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের কাছাকাছি কি একটা বাড়ীর ঠিকানাও যেন কলকাতার অফিসে তার রেকর্ড বুকে দেখেছি। অথচ সেই উইলশন এই রায়পুরে তাব বাড়ীতে ঘুরিয়ে আনতে চাইছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কলকাতায়!

উইলশন বলল, কলকাতায় আমি একা থাকি। আমাব ফ্যামিলি এখানেই থাকে। চলুন চট্ করে ঘুরে আসি। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। আবার বৃষ্টি আসতে পারে।

মনে মনে ভাবলাম, দুদিন ধরে তো শুধু গাড়ী, রাস্তা আর পেট্রোল পাম্পের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। উইলশনের সংগে একটু বেড়িয়ে এলে মন্দ হয় না।

উইলশন একটা সাইকেল রিক্সা করল। রিক্সা বাজার পেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকলো। গলির মুখেই ছোট একতলা বাড়ীর সদর দরজায় কড়া নাড়তেই একজন বছর তেইশের যুবক দরজা খুলেই সামনে উইলশনকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল, হ্যালো ফাদার।

উইলশন জোরে হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে যুবকটির গালে আলতোভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে আমাকে বলল, মাই নটি বয়। জর্জ উইলশন।

পরে আমার দিকে দেখিয়ে জর্জকে বলল, আমাদের মহামান্য অতিথি মিষ্টার দাস।

যুবকটি আমার সংগে করমর্দন ক'রে দরজা ছেড়ে পাশ ফিরে দাঁড়াল।

উইলশনের পিছু পিছু আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলাম।

মিষ্টার আর. এল. উইলশন। পুরোনাম রবার্ট লুই উইলশন। ইংল্যাণ্ডের হারফোর্ডশায়ারের এক খামার বাড়ীতে উনিশশো উনত্রিশ সালে উইলশনের জন্ম হয়। তার বাবা ছিলেন এক সওদাগরি জাহাজ কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কোম্পানীর কাজে তাকে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। উনিশশো আটচল্লিশ সালে একবার তিনি কলকাতায় আসেন। সেই সময় হঠাৎ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র সাতদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। রবার্ট উইলশনের বয়স তখন তেইশ বছর।

বিদেশ বিভূঁই কলকাতায় মা আর ছোট বোন ওসবোর্নকে নিয়ে উইলশন মহা বিপদে পড়ল। এই দুঃসময়ে জাহাজ কোম্পানীর কাছ থেকে কিছু অর্থ পাওয়ার আশায় সে কলকাতার বন্দরে কদিন খুব ছোটাছুটি করল। কিন্তু কোন লাভ হ'ল না। হারফোর্ড-শায়ারের এই উইলশন পরিবারটিকে কিং জর্জ ডকে ফেলে রেখে জাহাজ আবার ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিল।

ভারতবর্ষ তখন সবেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। কলকাতা ছেড়ে বেশীর ভাগ ইংরেজই তখন স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত। এই সময় অসহায় উইলশন কপর্দকশূন্য হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ক্রমে তার এমন অবস্থা হ'ল যে রাজপথে দাঁড়িয়ে তাকে ভিক্ষে পর্য্যন্ত করতে হয়েছে।

সেই সময় একদিন বিদেশী এক তেলকোম্পানীর সেলস্ ম্যানেজার অমিয় মুখার্জী তার অফিসের সামনে ইংরেজ যুবক উইলশনকে ভিক্ষে করতে দেখে তাকে তার নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেল।

সামনের ঘরটাই বৈঠকখানা। একটা বেতের তৈরী লম্বা চেয়ারে মোটা করে গদি পেতে সোফার মত করা হয়েছে। লুই উইলশন আমাকে সোফায় বসিয়ে ভেতরে গেল।

এই প্রথম আমি একটি খাস ইংরেজ পরিবারে বেড়াতে এসেছি। সোফায় বসে ঘরের চারদিকে চোখ বোলালাম। ঘরে আসবাব-পত্র নেই বললেই হয়। সোফাটি ছাড়া একটি উঁচু টুলে ছোট একটা এ্যাকুইরিয়াম বসানো। তাতে কয়েকটি রঙীন মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সামনে ভেতরে যাবার দরজার মাথায় একটি ছোট ফ্রেমে একটি মাত্র ছবি। পরণে সামরিক বাহিনীর পোষাক।

লুই ফিরে এল। সংগে মিসেস্ উইলশন।

বেশ লম্বা চওড়া মিসেস্ উইলশন বয়সের ভারে একটু কুঁজো হয়ে চলে। মাথার সবকটি চুল পেকে গেছে। শীর্ণ চেহারা। পরণে ছাপা সিল্কের স্কার্ট হাঁটু পেরিয়ে অনেকটা নীচে নেমে গেছে। কতকটা গাউনের মত কোমরের কাছে বাঁধা।

লুই পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই মিসেস্ উইলশন হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিলো, মিসেস্ এমিলি সেলউড উইলশন।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রথম আমি একজন ইংরেজ মহিলার সংগে করমর্দন করলাম।

মিসেস্ এমিলি ধপাস করে আমার পাশে বসে পড়ল। তারপর খুব পরিচিত জনের মত বলল, আই লাইক বেঙ্গলী টু মাচ। সো আই লাইক ইউ।

আমি প্রায় সংগে সংগে উত্তর দিলাম, ভাগ্যিস আমি বাঙালী।

লুই উত্তর দিল, এমিলি লণ্ডনেব এক প্রাচীন ইংরেজ পরিবারের মেয়ে হলেও ভাবতবর্ষেই ওর জন্ম আর আগাগোড়াই ভারতের নাগরিক।

আমি মিসেস্ উইলশনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ছেলেবেলায় কোথায় মানুষ হয়েছেন?

এমিলি তাডাতাড়ি উত্তর দিল, পেশোয়ারে।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই কোন বাঙালী পরিবারে।

এমিলি সেলউড বাচ্চা মেয়ের মত বলল, মোটেই না।

জর্জ এতক্ষণ বাইরে ছিল। ঘরে ঢুকতেই এমিলি বলল, আমার বড় ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তো?

জর্জ নিজেই বলল, ইয়েস্ মামি। আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। আমি পূর্ণিমাকে ডাকতে গিয়েছিলাম মিষ্টার দাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো বলে।

লুই জিজ্ঞেস করল, পূর্ণিমা কোথায়?

জর্জ উত্তব দিল, এ্যাডাকে নিয়ে মার্কেটিং-এ গেছে।

আমি জর্জকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কর?

জর্জ বলল, আমি এখানকার একটি ফ্যাক্টরীর সুপারভাইজার। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমার ডিগ্রি আছে।

জর্জের বয়স অল্প। তাকে যুবক না ব'লে তরুণ বলাই ভাল।

ধবধবে গায়ের রঙে ঈষৎ লালচে ভাব। বেশ স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ চেহারা তার।

মিসেস্ উইলশন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি পেশোয়ারে মানুষ হয়েছি কিনা জিজ্ঞেস করলেন কেন বলুন তো?

আমার হয়ে লুই উত্তর দিল, বুঝলে না। তোমার বাঙালী প্রীতিতে ওনার সন্দেহ হচ্ছে।

মিসেস্ উইলশন বড় বড় চোখ করে হাসতে হাসতে বলল, আই সি। কিন্তু না। বাঙালীকে ভালবাসি অন্য কারণে।

লুই আবার বলল, কারণটা বলেই দাও না।

এমিলি বলল, তাহলে বলেই দিই কি বল?

জর্জ আমাদের অনুমতি নিয়ে ভেতরে গেল।

মিষ্টার উইলশন একটা লম্বা চুরুট বার করে তাতে আগুন ধরিয়ে স্ত্রীর পাশে এসে বসল।

সেলউড আরম্ভ করল, এই যে মিষ্টার উইলশনকে দেখছেন এঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেতেন না যদি না মিঃ মুখার্জী এঁকে বাঁচাতেন।

রবার্ট লুই স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে বলল, ইয়েস্ মিঃ দাস। দোজ ডেজ আর গান। কিন্তু মিঃ মুখার্জীকে আমি বা আমার পরিবার কোনদিন ভুলবো না। আমার খুব দুঃসময়ে মিঃ মুখার্জী আমাকে, আমার মাকে আর ছোট বোন ওসবোর্নকে শুধু যে প্রাণে বাঁচিয়েছেন তা নয় তিনি আমাদের চিরকালের রক্ষার ব্যবস্থাও করে গেছেন।

স্ত্রীর দিকে ফিরে লুই বলল, মিঃ দাসকে তুমি আমাদের এ্যাল-বামটা দেখাতে পারতে।

এমিলি উঠে বলল, ইয়েস। আমি এখুনি আনছি।

একটু পরেই মিসেস উইলশন এ্যালবাম এনে লুই-এর হাতে দিয়ে আবার ভেতরে চলে গেল।

লুই এ্যালবাম খুলে প্রথমেই যে ছবিটা আমাকে দেখালো তিনিই মিষ্টার অমিয় মুখার্জী। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বয়সের মিষ্টার মুখার্জীর চেহারাটি ষোল আনা বাঙালীর মতই। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। একমাথা রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল। ছবির নীচে চাইনিজ ইংক-এ ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা, বর্‌ন—এপ্রিল নাইনটিন হাণ্ড্রেড ফোর। ডেথ্—ডিসেম্বর নাইনটিন হাণ্ড্রেড সিক্সটি এইট।

লুই বলল, ওনলি টুয়েন্টি ইয়ার্স। দেন ফিনিশড্। মাত্র কুড়ি বছর তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম। আমাদের তিন জনের জন্য তিনি কি না করেছেন। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে মা দারুন ভাবে মেনটাল শক্ পেয়েছিলেন। মিষ্টার মুখার্জী মাকে একটি মানসিক চিকিৎসা আশ্রমে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সেখানেই একটানা চার বছর চিকিৎসাধীনে থাকার পর একদিন হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মা মারা যান।

রবার্ট লুই চুপ করল। বোধহয় তার মার স্মৃতি মনে পড়ল। খুব ধীরে ধীরে চুরুটে কয়েকটা ছোট ছোট টান দিয়ে বলল, আমি মিষ্টার মুখার্জীর গাড়ী চালাতাম। আর আমার বোন ওসবোর্ন মুখার্জীর দুটি মেয়ের সংগে স্কুলে পড়ত। ওসবোর্ন এখন ক্যালি-ফোর্নিয়ায়। তার হাজব্যাণ্ড একজন এ্যাডভোকেট্।

প্রায় ছুটতে ছুটতে দুটি মেয়ে বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকল।

লুই আমার সংগে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল, মাই ডটার, এ্যাডা উইলশন এ্যাণ্ড মাই ডটার-ইন্-ল্, পূর্ণিমা উইলশন।

আমি দুজনকেই দেখলাম। এ্যাডার বয়স ধরতে পারলাম না। বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। চোখের মণিদুটো নীল। আঁটসাঁট পোষাকেও তাকে কেমন আলুথালু দেখাচ্ছে। ডান হাতে একটা ষ্টিলের ফোল্ডিং ছাতা আর বাম হাতে দুটি কাগজের প্যাকেটে ভর্তি কি সব জিনিষপত্র। একটু পিছিয়ে হাঁটুভেঙে মাথা নীচু করে আমায় অভিবাদন জানিয়ে এ্যাডা সংগে সংগে ভেতরে চলে গেল।

এবার পূর্ণিমা উইলশন।

দেখে অবাক হলাম। একখানি সুন্দর নিটোল গোল মুখ। তবে কেমন যেন বিষণ্ণ ভাবুক ভাবুক। দুহাত জোড় করে আমায় নমস্কার জানিয়ে শ্বশুরের পাশে বসে আমাকে বলল, এক্সকিউজ মি, আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

মিষ্টার উইলশন ছেলের বউ-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, বাট মাই ডটার, তুমি আমায় ভাবিয়ে তুললে। তোমাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। এনিথিং রং?

পূর্ণিমা বলল, না বাবা। মিষ্টার দাসের সংগে আলাপ করব বলে তাড়াতাড়ি এসেছি তাই একটু টায়ার্ড লাগছে। ও কিছু নয়।

আমি বললাম, তাহলে একটু রেষ্ট নেওয়া হোক।

পূর্ণিমা বলল, না না তার কোন দরকার নেই।

লুই এ্যালবাম হাতে উঠে পড়ে আমাকে বলল, আমাদের হাতে বেশী সময় নেই। আপনি পূর্ণিমার সংগে আলাপ করুন। আমি ভেতর থেকে আসছি।

লুই চলে যেতে পূর্ণিমা উইলশন আরও একটু সহজ হয়ে সোফায় মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বলল, আমি কিন্তু খাঁটি বাঙালী। বুঝতে পারছেন তো?

আমি হেসে বললাম, সে তো তোমার নাম আর পোষাক দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাপের বাড়ী কোথায়?

পূর্ণিমা বলল, আমার মা আর ভাইয়েরা বাবার সংগে বোম্বাই-এ থাকে। আমাদের আসল বাড়ী কিন্তু হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে। আমাদের পদবী দত্ত। সেখানে আমার কাকা কাকিমা থাকেন। আমি তাদের কাছেই মানুষ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বোম্বাই-এ তোমার বাবা কি করেন?

পূর্ণিমা বলল, বাবার জুয়েলারীর ব্যবসা।

আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞেস

করলাম, জর্জের সংগে তোমার কি করে বিয়ে হল ?

পূর্ণিমা বলল, ভারী আশ্চর্য্য লাগছে তাই না ?

আমি সত্য গোপন না করে বললাম, তা একটু লাগছে বৈকি। এমন খাস ইংরেজ পরিবারে একেবারে ডোমজুড়ের বিশুদ্ধ বাঙালী বউ দেখলে কে না আশ্চর্য্য হবে বল।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। জর্জকে নিয়ে আমি যখন ডোমজুড় যাই তখন কিন্তু আমায় ছেড়ে ওকে দেখতেই বেশী ভীড় জমে যায়।

আমি মৃদু হেসে বললাম, খুব স্বাভাবিক। জর্জ দেখার মতই ছেলে বটে।

পূর্ণিমা বলল, আমার কাকাও তাই বলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের বিয়ে কোথায় হয়েছিল ?

পূর্ণিমা বলল, ডোমজুড়েই। জর্জরা তখন কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে মিষ্টার মুখার্জীর বাড়ীতেই থাকত। মিষ্টার মুখার্জীই আমাদের বিয়ের ঘটকালি করে যান।

আমার বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, মিষ্টার অমিয় মুখার্জীর কথা বলছ ?

পূর্ণিমা বলল, হ্যাঁ। মিষ্টার মুখার্জী ছিলেন আমার কাকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুব ছোট বয়সে আমি তাঁকে দু-একবার কাকার বাড়ীতে যেতে দেখেছি। মিঃ মুখার্জী আমার শ্বশুর মশাইকে খুব ভালবাসতেন। আর আমার শ্বশুর মশাই ভালবাসতেন বাঙালীকে। তাঁর ধারণা মিষ্টার মুখার্জী যেহেতু বাঙালী সেহেতু বাঙালী মাত্রেই অতুলনীয়। মিষ্টার উইলশন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যদি তার প্রথম সন্তান পুত্র হয় তবে তিনি পুত্রবধূ করবেন বাঙালী। জর্জের এগার বছর বয়সের সময় মিঃ মুখার্জী আমার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে তার ভাবী পুত্রবধুর সন্ধানে বেরিয়ে আমায় আবিষ্কার করলেন। আমি তখন সাত বছরের শিশু।

আমি বললাম, কিন্তু এত আগে থাকতে জর্জের বিয়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন কেন?

পূর্ণিমা বলল, উইলশন পরিবারের বংশে এই ভাবেই বধূ নির্বাচনের রেওয়াজ ছিল।

—তাহলে মিষ্টার উইলশনের বিয়ের ব্যবস্থাও কি এইভাবে হয়েছিল।

—হ্যাঁ। আমার শ্বাশুড়ীর বাপের বাড়ী লণ্ডনে। কিন্তু ওনার বাবা থাকতেন পেশোয়ারে। তিনি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন।

আমি ঘরের মধ্যে দরজার মাথায় টাঙানো ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ছবিতে যাঁকে দেখছি তিনিই কি মিসেস্ উইলশনের বাবা?

পূর্ণিমা বলল, আপনি ঠিকই ধরেছেন। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সেবার কলকাতায় এসে তিনি অনেক দিন ছিলেন। সেই সময় আমার শ্বশুর মশাইয়ের বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেদিন থেকেই আমার শ্বাশুড়ীর বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে যায়।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, কিছু মনে কোরো না। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। এদের পরিবারে তোমার থাকতে কোন অসুবিধে হয় না?

পূর্ণিমা বলল, না। বিয়ের আগে আমি বহুদিন উইলশন পরিবারের সংগে মিশেছি। তাছাড়া ইংরেজ পরিবারের বউ হবার জন্য আমি আগাগোড়া ইংরেজী স্কুলেই লেখাপড়া শিখেছি।

—এদের কেমন লাগে তোমার?

—খুব ভাল। এক কথায় চমৎকার। আমার জন্যে এরা সব সময় চিন্তা করে। এরা সবাই আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে। অবশ্য সব কিছুই সম্ভব হয়েছে মিষ্টার মুখার্জির জন্য। তাঁর প্রতি গোটা উইলশন পরিবারের কৃতজ্ঞতা অতুলনীয়। মিষ্টার মুখার্জী সমস্ত

বাঙালী জাতটিকে এই ইংরেজ পরিবারটির কাছে যে শ্রদ্ধা আর ভালবাসার আসনে বসিয়ে গেছেন তা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। আমি নিজেও তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ।

পূর্ণিমা উইলশন চোখ বন্ধ করে যেন মিষ্টার অমিয় মুখার্জীকে আর একবার মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল।

আমি পূর্ণিমাকে শেষ প্রশ্ন করলাম, জর্জকে তোমার কেমন লাগে?

পূর্ণিমা বলল, জর্জ একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। ওর ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফরেন যাবার ইচ্ছে আছে। দিনরাত ফ্যাক্টরী আর পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তবু বলব, হি ইজ ভেরী সিম্পল।

রাস্তায় বেরিয়ে উইলশন আবার রিক্সা করতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, হেঁটেই যাওয়া যাক।

ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। আকাশ আবার কালো হয়ে এসেছে। বোঝা যাচ্ছে আবার বৃষ্টি হবে। প্রায় দু-ঘণ্টা উইলশন পরিবারে কাটিয়ে এলাম। অনেকগুলি মানুষের সংগে পরিচয় হল। একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হ'ল। সকলের চেয়ে কিন্তু পূর্ণিমা উইল-শনের মুখটাই বেশী করে চোখের সামনে ভাসছে।

যেতে যেতে উইলশনকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে রায়পুরে জর্জ চাকরী করে বলেই সকলের এখানে থাকা হয়?

লুই বলল, হ্যাঁ। শুধু আমিই থাকি না।

প্রশ্ন করলাম, কেন?

—আমার স্বভাব বলতে পারেন। আপনাদের ভারতবর্ষে বিশেষ

ক'রে কলকাতার একান্নবর্তী পরিবারের সংগে আমাদের কোথায় যেন একটা মিল আছে। একটা সংসারে সবাই মিলেমিশে থাকার প্রথা আমাদের মধ্যেও চালু আছে। কিন্তু আমি পারি না। আমি কখনও নিজেকে ভিড়ের মধ্যে কল্পনা করতে পারি না। আই ওয়ান্ট টু লিভ্ এলোন।

আমি কিছু বললাম না। মনে মনে ভাবলাম, উইলশনের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা দুঃখ লুকিয়ে আছে। কিসের দুঃখ বুঝলাম না। মিসেস্ উইলশন, জর্জ, এ্যাডা আর পূর্ণিমা—এই তো কটা মানুষ। ছোট্ট সংসার। দেখে তো মনে হ'ল সবাই সুখী। এর মধ্যে শুধু লুই-ই একা। কলকাতার ছোট্ট বাসায় একা থেকে সে গোটা ভারতবর্ষ গাড়ী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর রায়পুরে তার গোটা পরিবার পড়ে থাকে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হ'ল। আমরা দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। উইলশনকে দেখলাম অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছে। কি ভাবছে জানিনা। হয়ত মিসেস উইলশনের কথা। আবার কতদিন পর দেখা হবে কে জানে।

কনভয় ড্রাইভারস্ ইউনিয়নের সদস্য উইলশন। বছরে তিন টাকা করে চাঁদা দেয় সে। আটশো ড্রাইভারের মধ্যে কতবার তার নাম ওঠানামা করে। কত রকমের গাড়ী। এ্যামবাসাডার, ফিয়েট, ষ্ট্যাণ্ডার্ড হেরল্ড, জিপ্, মার্শেটিস, বেড-ফোর্ড। কত নতুন জায়গা। বোম্বাই, পাঞ্জাব, আগরতলা, দিল্লী, নাগাল্যাণ্ড, কলকাতা, আসাম, নেপাল, মাদ্রাজ।

পাম্পে পৌঁছোতেই ভিজে গেলাম। ব্যানার্জীকে দেখতে পেলাম না। অগত্যা গাড়ীতেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম।

বৃষ্টিটা বেশ জোরেই এল। আমি পেছনের সীটে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে উঁকি মেরে মিশ্রজীর রান্নাঘরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, এলাহি কাণ্ড। চরণ সিং, নন্দলাল আর

মিশ্রজী তিনজনেই রান্নায় ব্যস্ত। গোটা চালাঘর জুড়ে নানা-রকমের সরঞ্জাম। ঘড়িতে দেখলাম প্রায় পৌণে এগারটা। মিশ্রজী বলেছেন রান্না শেষ হ'লে চরণ সিং আমায় ডেকে নিয়ে যাবে। রান্না এখনও চলবে। অতএব কপালে আজ দুর্ভোগ।

বসে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখলাম বৃষ্টি থেমে গেছে। কাঁচটা সরিয়ে দেখি দু-তিন জন ড্রাইভাব মহম্মদ আলিকে চেপে ধরে আছে আর মহম্মদ হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে ওদেব হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা কবছে।

আমি ঘড়ি দেখলাম রাত দেড়টা। হঠাৎ নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিধেয় পেটটা চোঁ চোঁ করতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে মিশ্রজীর চালাঘরের দিকে এগোতে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোথায় মিশ্রজী? কোথায় তার চবণ সিং। রান্না ঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে মিশ্রজী তার দুই সাকরেদকে নিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। অবাক হয়ে গেলাম। একবার ভাবলাম, তাহলে কি আমি ঘুমোচ্ছি দেখে চরণ সিং আমার খাবার গাড়ীতে রেখে গেছে।

তাড়াতাড়ি আবার গাড়ীতে ফিরে এলাম। সামনে পেছনে সীটের ওপর নিচে চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও ডাল-পুরির এককণা ডালও দেখতে পেলাম না।

মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবতে আরম্ভ করলাম। মিশ্রজী কি ভুলে গেলেন। নাকি ডেকে ডেকে আমার সাড়া না পেয়ে চরণ সিং ফিরে গেল। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হ'ল। আর ঘণ্টা খানেক জেগে থাকলে কি ক্ষতি হ'ত। দিব্যি ডালপুরি দিয়ে মুরগীর মাংস খেয়ে তেড়ে ঘুম লাগাতে পারতাম।

হতাশ হয়ে আবার গাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

ওদিকে মহম্মদ আলিকে সবাই মিলে চেপে ধ'রে তার মাথায় বালতি করে জল ঢালছে। তারমধ্যে ব্যানার্জীকেও দেখলাম।

আমায় দেখতে পেয়ে ব্যানার্জী এগিয়ে 'এসে বলল, মহম্মদ আলি দারুন মদ খেয়েছে। দু-তিনবার বমি করেছে। তাই মাথায় জল ঢালছে। আপনাকে খুঁজেছিলাম। শুনলাম উইলশনের সঙ্গে বেরিয়েছেন। ফিরে এসে দেখলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন। তাই আর বিরক্ত করিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, চরণ সিংকে আমার খোঁজ করতে দেখেছ?

ব্যানার্জী বলল, কই নাত।

—মিশ্রজীও কিছু বলেন নি?

—না।

আমি আর ব্যানার্জীর কাছে নিমন্ত্রণের কথা তুললাম না।

ব্যানার্জী নিজেই বলল, আমরাও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মহম্মদ এসে চেঁচামেচি করে ঘুম ভাঙাল।

আমার আর কোন কিছু শুনতে ভাল লাগছিল না। সেই কোন দুপুরে সারাইপালিতে ভাত খেয়েছি। উইলশনের বাড়ীতে মিসেস উইলশন নিজের হাতে প্যাটিশ তৈরী করে চায়ের সঙ্গে খেতে দিয়েছিল। রাত্রে নিমন্ত্রণ খেতে পারব না বলে অমন সুন্দর প্যাটিশের সবগুলো না খেয়ে ভদ্রতা করে দুখানা মাত্র খেয়েছি। এখন ভাবছি কি ভূলই না করেছি।

মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ হ'য়ে গেল। মনে মনে খুব অপমানিত বোধ করলাম। এমন সময় মহম্মদ আলি এসে আচমকা পা-দুটো জড়িয়ে ধরল।

ব্যানার্জী তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল।

মহম্মদ তাকে এক ঝটকায় দূরে ঠেলে দিয়ে আমার পায়ে মাথা

ঠেকিয়ে বলল, বাবুজী ম্যায় খুনী হু, ডাকু হু, মগর ম্যায় বেইমান নেহি হু।

মহম্মদের কথা জড়ানো। তার শরীর টলছে। সারা দেহে উগ্র মদের গন্ধ।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে। কে বলেছে তুমি বেইমান। নাও পা ছাড়ো।

মহম্মদ পা না ছেড়ে বরং আরো শক্ত করে চেপে ধরল, আপ হামারা কসুর মাপ কিজিয়ে বাবুসাব। ম্যায় কভি ঝুট নেহি বোল্‌তা।

আমি মহা মুশকিলে পড়লাম। একে ক্ষিদের জ্বালায় মরছি। তার ওপর রাত দুপুরে এইসব উটকো ঝামেলা ভাল লাগছে না। অথচ জোর করে পা ছাড়িয়েও নিতে পারছি না। মহম্মদ আলির ওপর জোর খাটে না। হয়তো রেগে গিয়ে পা ছেড়ে দু'হাত দিয়ে আমার গলাটাই টিপে ধরবে।

ব্যানার্জীকে দেখলাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করছে। কিন্তু সে আমার থেকেও নিরুপায়। কেননা, আমি মহম্মদের সবকিছু জানি না। এই দু'দিনে তার যতটুকু জেনেছি তাতে তাকে ততটুকুই ভয় করছি। অথচ ব্যানার্জী এই মহম্মদকে বহুদিন ধরে দেখছে। তাই তার ভয় আমার থেকেও বেশী।

হঠাৎ দেখলাম উইলশন এসে হাজির হ'ল। সে মহম্মদের কাছে গিয়ে হিন্দিতে তাকে বোঝাতে লাগল। বলল, মহম্মদ নাকি আমাকে অপমান করেছে। সে আমার পা জড়িয়ে ধরায় আমি তার ওপর খুব রাগ করেছি।

ব্যাস। এতেই কাজ হ'ল। মহম্মদ আমার পা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যেতেই উল্টে পড়ে যাচ্ছিল।

উইলশন তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলল।

মহম্মদ বলল, নেহি। বাবুজী বহুত আচ্ছা আদমি। ম্যায় উনকো অপমান নেহি কিয়া। এইসা কভি নেহি হো সেকতা।

উইলশন বলল, তব্ চলো। আপনা কাম করো। রাত জাদা হো গিয়া। বাবুজীকো শোনে দেও।

মহম্মদকে একরকম ঠেলতে ঠেলতে তার গাড়ীতে তুলে দরজা এঁটে দিল উইলশন।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ক্ষিদেটা এতক্ষণ মহম্মদের ভয়ে চুপচাপ ছিল। এখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

উইলশন ফিরে এসে ব্যানার্জীকে নিচু গলায় কি একটা কথা বলল। কথাটা শুনে ব্যানার্জীর মুখ শুকিয়ে গেল। আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে সে মুখ নীচু করে নিল।

আমার শরীরটা ভাল লাগছিল না। গাড়ীতে ব'সে মাথাটা সিটে হেলিয়ে দিলাম।

একটু পরেই উইলশনের গলা শুনতে পেলাম। ব্যানার্জীকে সে খুব বকাবকি করছে। বলছে, শেঠজী নিজে তোমার ওপর বাবুর দায়ীত্ব দিয়েছে আর তুমি কিনা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছো। তোমার কোন মনুষ্যত্ব নেই। এত রাত পর্য্যন্ত বাবুজীর কিচ্ছু খাওয়া হ'ল না। আর তুমি দিব্বি হোটেলে বসে পেটভরে খেয়ে এলে। ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। এমন জানলে আমি বাবুজীকে জোর করে আমার বাড়ী থেকে খাইয়ে আনতাম।

ব্যানার্জী অপরাধীর মত বলল, বিশ্বাস করো উইলশন, আমি জানতাম না। তোমার সংগে বেরিয়েছেন শুনে আমি ভেবেছি নিশ্চয়ই কোথাও খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবেন।

আমি বুঝলাম, যে করেই হোক উইলশন বুঝতে পেরেছে যে আমার খাওয়া হয় নি।

ব্যানার্জী, উইলশনকে বলল, একটা কিছু কর ভাই। নইলে

কাল সকালে বাবুর কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

উইলশন বলল, কি করব? এত রাতে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। রায়পুরের কোথাও আর একখানা রুটিও পাবে না।

—কিন্তু বাবুজী যে সারারাত না খেয়ে থাকবেন।

—তবে চলো আমার বাড়ীতে যাই। যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়।

—তাই চলো।

উইলশন আর ব্যানার্জী আমার দৃষ্টি এড়িয়ে চুপি চুপি বেরুতে যাচ্ছিল।

আমি দুজনকেই ডাকলাম। বললাম, তোমাদের সব কথাবার্তা আমি শুনেছি। আমার জন্যে তোমরা যে সত্যিই এত ভাবতে পারো সেটা আমি ভাবতে পারি নি। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু এত রাতে আর তোমাদের কষ্ট করতে হবে না। দুটো বেজে গেছে। ভোর হ'তে আর ক'ঘণ্টাই বা আছে। তোমাদের সারাদিন গাড়ী চালাতে হবে। যাও শুয়ে পড়ো।

উইলশন আর ব্যানার্জী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

আমি আবার বললাম, আমার জন্য ভেবো না। কত কারণে কত রাত এমন না খেয়ে কেটেছে। কাল সকালে ব্রেক-ফাস্টটা না হয় ডবলই খাবো।

উইলশন আমাকে গুড নাইট জানিয়ে তার নিজের গাড়ীতে শুতে গেল। আর ব্যানার্জী, সেই যে মুখ নিচু করে ছিল সেই ভাবেই গাড়ীর সামনের দরজা খুলে নিঃশব্দে সিটের ওপর শুয়ে পড়ল।

আমার আর ঘুম এলো না। সিটের ওপর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, কি বিচিত্র এই কনভয়! কত রকমের মানুষ। কত অদ্ভুত তাদের চরিত্র। মনে হল, এই গাড়ী, ড্রাইভার, পথচলা,

হল্ট। এই লাইনিং, মার্চ, হোটেলে খাওয়া, গাড়ীতে ঘুমানো সব মিলিয়ে এই গোটা কনভয় যেন সাময়িক কয়েক দিনের এক বিচিত্র সংসার। আসল সংসারের মত এ সংসারেও মান-অভিমান, স্নেহ-ভালবাসা, ন্যায়-অন্যায়, ভুল-ভ্রান্তি সব কিছুই আছে। এখানে গৃহত্যাগের দুঃখ আছে তাই কান্নাও আছে। এখানে পথ চলায় মুক্তি আছে তাই আনন্দও আছে।

হঠাৎ সেই পাঞ্জাবী ড্রাইভারটির কথা মনে পড়ল। লোকটি সত্যিই ভাগ্যবান। অমন সাংঘাতিক এ্যাক্সিডেণ্টে পড়েও কিভাবে যে বেঁচে গেল ভাবাই যায় না।

উইলশনের বাড়ী থেকে ঘুরে এসেই একবার উঁকি দিয়ে দেখে এসেছিলাম। ডাক্তার এসে কি সব ওষুধপত্র দিয়ে গেছে। ভয়ের কিছুই নেই। পেটের মধ্যে নোংরা জল ঢুকে গিয়েছিল। রামকুমার খুব দক্ষতার সঙ্গে জল বার করে দিয়ে ভালই করেছে। এখনও বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। তখন তো দেখলাম সেই খালাসি গোছের ছেলেটি মাথার কাছে ঠায় বসে আছে। বেচারি খুব ভাবনায় পড়ে গেছে। এ অবস্থায় ড্রাইভারের কিছু হ'লে একা ও খুব বিপদে পড়বে।

পেট্রোল পাম্পের ঘড়িতে রাত আড়াইটের ঘণ্টা পড়ল। আমার চোখ থেকে ঘুম একেবারে চলে গেল।

গাড়ীর দরজা খুলে আবার বাইরে এলাম।

এতক্ষণে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। দু-একটা তারা দেখতে পাচ্ছি। গোটা পেট্রোল পাম্প ঘুমে অচৈতন্য। শুধু মিশ্রজীকে দেখলাম অল্প-অল্প ঢুলতে-ঢুলতে মাঝে-মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে

জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করছে।

একটু আগে মিশ্রজীর ওপর বেশ রাগ হয়েছিল। এখন যেন কেমন মায়া লাগছে। বয়স হয়েছে। তাই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আমরা এই বয়সেই কত লোককে কত কথা দিয়ে রাখতে পারি না। অনেক সময় ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাই। মিশ্রজী নিশ্চয়ই তা করেনি। হয়ত ভুল করেই নিমন্ত্রণ করেও ডাকতে ভুলে গেছে।

যাই হোক আমার খিদে একেবারে মরে গেছে। এখন খাবার পেলেও খেতে পারব না। সুতরাং মিশ্রজীর ওপর রাগ করে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং অসুস্থ পাঞ্জাবীটিকে আর একবার দেখে আসি।

গুটি গুটি পায়ে এ গাড়ী সে গাড়ীর ফাঁক গ'লে গ'লে খাটিয়ার কাছাকাছি যেতেই অবাক হয়ে গেলাম।

পাঞ্জাবী ড্রাইভারটি আর সেই খালাসি গোছের ছেলেটি দু-জনে দুটো খাটিয়ায় বসে দিব্যি মাংস রুটি খাচ্ছে। সঙ্গে এক বোতল মদ আর দুটো বড় বড় মাটির ভাঁড়ও রয়েছে। মাঝে মাঝে তারও সদ্‌ব্যবহার চল্‌ছে।

আমি একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। ঠিক এ অবস্থায় ওদের দেখবো আশা করিনি। কি করব ভাবছি এমন সময় সেই পাঞ্জাবী ড্রাইভারটি আমার থেকেও পরিষ্কার বাংলায় বলল, আসুন না বাবু।

আমি অবাকের ওপর অবাক হলাম। এর আগে কোন অবাঙালীকে এই কনভয়ে এমন বাংলা বলতে শুনিনি।

এগিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি খাটিয়ায় আমার বসার জায়গা করে দিয়ে পাঞ্জাবীটি বলল, আপনি না এলে কাল সকালে আমিই আপনার কাছে যেতাম।

আমি বললাম, কি ব্যাপার!

মদের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে সে বলল, আপনাকে আমার চেনা চেনা

লাগছে। আপনার কি হাওড়ায় বাড়ী?

—হ্যাঁ।

—আমাকে কোথাও দেখেছেন?

আমি ড্যাব্-ড্যাব্ চোখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ভিজে এলো চুলে আবার ঝুঁটি বেঁধেছে। মুখের দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। আমার মত ওর মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। একটু আগের অসুস্থতার বিন্দুমাত্র চিহ্নও চোখে-মুখে দেখতে পেলাম না।

আমি অনেক চেষ্টা করেও মুখটা মনে করতে পারছি না।

মুখ থেকে মাংসের হাড় বার করে সে বলল, আপনি অসীম গাঙ্গুলীকে চেনেন?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চিনি। আমাদের পাড়ায় থাকে। জি. ই. সি-তে চাকরি করে।

অসীম আমার বন্ধু। অনেক দিনের। ওর বাড়ী গিয়েই আপনাকে দেখেছি। ওর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, বলদেও সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

আমার চট্ করে নামটা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ নামটা শোনা শোনা। অসীমদার কাছেই শুনেছি।

বলদেও সিং বলল, আমি বহু বছর আপনাদের রামরাজাতলা লাইনে পাবলিক বাসের ড্রাইভারী করেছি। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম কোথাও দেখেছেন কিনা।

আমার লজ্জা করল। বলদেও সিং কত বছর ধরে আমাদের লাইনে ড্রাইভারী করেছে। আমি একদিনও ওকে দেখিনি। অথচ ও কবারই বা আমাদের পাড়ায় গেছে তারই মধ্যে আমায় চিনে রেখেছে।

আমার মনের লজ্জা বোধহয় চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। তা দেখে বলদেও সিং বলল, অবশ্য আমাকে চেনার কথা নয় আপনার।

আমরা ড্রাইভারেরা এ্যাক্সিডেন্ট না করলে লোক আমাদের চিনতে পারে না।

কথাটা ভাববার। আমাদের মত সাধারণের সঙ্গে ড্রাইভারদের কতটুকুই বা সম্পর্ক। এখনকার সময় ছুটছে। তাই আমাদেরও ছুটতে হবে। বাসে চেপে মনে হয় উড়ে গেলে ভাল হত। এক্ষেত্রে নিজেদের গন্তব্যস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছানোটাই বড় কথা। এর মধ্যে কে গাড়ী চালাচ্ছে, কি-ই বা তার পরিচয়—এসব অবান্তর। গাড়ী চললেই হল। কেইবা চালক। সবাইকে পেছনে ফেলে যে করেই হোক সবার আগে পৌঁছান চাই। নইলে ট্রেন ধরতে পারব না। নইলে অফিসে লেট মার্ক হয়ে যাবে। নইলে সিনেমা শুরু হয়ে যাবে। নইলে পরীক্ষা বসে যাবে।

আমি কিন্তু এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললাম, এখন শরীর কেমন?

বলদেও বলল, ভাল। এ সামান্য আঘাতে আমাদের কিছু হয় না।

—কি করে এমন এ্যাক্সিডেন্ট হ'ল?

—টার্নের মুখে ব্রেক ফেল করেছিল।

আমি খালাসি গোছের ছেলেটির দিকে তাকালাম। ভাঁড় ছেড়ে বোতল সুদ্ধ মদ গলায় ঢেলে খাওয়া শেষ করল।

বলদেওকে বললাম, বেশ তো পাবলিক বাসের ড্রাইভারী হচ্ছিল। তা হঠাৎ আবার ট্রান্সপোর্টে আসা হল কেন?

ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বলদেও সিং বলল, আমাদের লাইনে পাবলিক আর প্রাইভেটে কোন তফাৎ নেই বাবু। ড্রাইভারী শিখলে গাড়ী চালাতে হবে। তবে পাবলিক লাইনে আগে রোজগার ভাল ছিল তাই কাজে মন লাগত। এখন ওলাইনে আর চলে না।

—কিন্তু এত যে লোক পাবলিক বাস চালাচ্ছে?

—না চালালে চলবে কেন। বাস চললে ড্রাইভার চাই। তবে অধিকাংশই লোকাল লোক। আমরা চারপুরুষ ধরে এ লাইনে আছি। আমার বাপ-ঠাকুর্দা অবশ্য পাবলিক বাস চালিয়েই কাটিয়ে গেছেন। আমাকেও হয়ত কাটাতে হ'ত। তার আগেই ট্রান্সপোর্টে নাম লিখিয়েছি। ভাইটাকে সঙ্গে রেখে একটু আধটু ট্রেনিং দিচ্ছি।

আমি বললাম, ভাই! কোন্ ভাই?

বলদেও সেই খালাসি গোছের ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, এইতো আমার ভাই। এর নাম জগতার সিং।

আমার চোখ ছানা বড়া হয়ে গেল। বলদেও সিং বলে কি! এই খালাসি ছেলেটা ওর ভাই। আশ্চর্য! বলদেও সিং-এর সঙ্গে এর একটুও সাদৃশ্য নেই! বলদেও ধব্‌ধবে ফর্সা, লম্বা-চওড়া চেহারা তার। অথচ জগতার সিং কালো, রোগা। মাথার চুল বিহারীদের মত কদম ছাট। পাঞ্জাবের ছেলে ব'লে চেনবার বিন্দু-মাত্র উপায় নেই।

কিন্তু আরও আশ্চর্য্য হলাম অন্য কারণে। একটু আগে এই জগতার সিংকে দেখলাম বলদেও সিং-এর সংগে ভাগাভাগি করে মদ খেতে।

ব্যাপারটা কেমন হল? জগতার সিং ছোট ভাই। বয়সে বোধহয় বলদেও সিং-এর অর্ধেক। অথচ দাদার সামনে দাদার বোতল থেকেই মদ নিয়ে ইচ্ছে মত গলায় ঢালল। লজ্জা বা ভয় তো দূরের কথা। বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েছে বলেও তো মনে হ'লনা।

ঘড়িতে প্রায় তিনটে।

জগতার সিং খাটিয়া গুছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছে বোধহয়। আমার আর বসে থাকা ঠিক হবে না। খালিপেটে আমার চোখে ঘুম নেই। তাই বলে এরাও ঘুমোবে না—তা হয় না। এত রাতে

পেটে খাবার পড়লে নির্ঘাৎ আলস্য আসবে। আর আলস্য কাটাতেই ঘুম।

কিন্তু বলদেও সিং-কে ব্যস্ত হতে দেখলাম না। খাটিয়ায় বসেই কুলকুচি করে দু-বার মুখ ধুয়ে লুঙ্গিতে হাত মুছে সোজা হয়ে বসল। ওর ভিজে জামা কাপড়গুলো একটা দড়িতে ঝুলছে। এখন অন্য কারও লুঙ্গি পরে আছে। গায়ে পাতলা কম্বল।

বলদেও সিং কম্বল খুলে পাশে জড়ো করে রাখল। ওর রোমশ-বুকের মাঝখানে কালো সুতোয় বাঁধা গুরু নানকের ছবি ঝুলছে। কি একটা গাছের নিচে শিখ ধর্মের প্রবর্তক লাহোরের তালবন্দী গ্রামের নানক নিজের শান্ত, সৌম্য মূর্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বলদেও সিং নানকের ছবি দেখিয়ে বলল, এই গুরুজী যতক্ষণ আমার সংগে থাকবেন ততক্ষণ কোন বিপদই আমার কাছে বিপদ নয় বাবুজী। তাছাড়া ড্রাইভারী করতে গেলে একটু-আধটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। আমার ভাই তো সবে বছর তিনেক লাইনে এসেছে। এরই মধ্যে আজ নিয়ে দু-দুবার এ্যাক্সিডেণ্টে পড়ল। এবার খুব তাড়াতাড়ি জলে ঝাঁপ দিয়ে অনেকটা দূরে সরে যেতে পেরেছিল।

আমি বললাম, কিন্তু এইটুকু ছেলেকে এত বিপদের মধ্যে রেখে লাভ কি? অন্য কোন কাজে দিলেই তো হয়। তাছাড়া এখন তো ওর লেখাপড়া শেখার বয়স।

বলদেও বলল, লেখাপড়া আমাদের ধাতে সয় না বাবু। আমার বাবা কিছুই লেখাপড়া শেখেন নি। আমি বছর দুয়েক স্কুলে পড়েছি। আমার ভাই বারো বছর বয়সে আমার কাছে চলে এসেছে। এখানে এসে তিন বছর পাবলিক বাসে কণ্ডাকটারের কাজ শিখে এখন আমার হেল্পার হয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই ড্রাইভারী লাইনে তাহলে

কতদিন হ'ল ?

বলদেও বলল, আমার ?

—হ্যাঁ।

—তা সাতাশ আঠাশ বছর। আঠারো বছর বয়সে গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরেছি। এখন পঁয়তাল্লিশ।

—দেখলে কিন্তু মনে হয় না এত বয়স হয়েছে।

—তবু তো আমার আগের চেহারা দেখেন নি। চল্লিশ বছর বয়সেও দেহের ওজন ছিল পঁচানব্বই কেজি। হাইট—ছ'ফুট তিন ইঞ্চি। ছাতি—চুয়াল্লিশ। আমি ছু'কেজি মাংস, তিন বোতল মদ আর আঠার খানা রুটি একসংগে খেতে পারতাম। কিন্তু পাবলিক বাসে ড্রাইভারী করে এত খাবার পাবো কোথায় ?

—কেন ? ড্রাইভাররা বেশ ভাল উপায় করে বলে শুনেছি। কি সব কমিশন-টমিশন আছে।

—টোটাল সেলের ওপর এগার পার্শেণ্ট কমিশন পেতাম। গড়ে রোজ আয় হ'ত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে। কিন্তু তাতেও থই পাই না।

আমি অবাক হই। একজন ড্রাইভার মাসে বারোশো টাকা উপায় করেও যদি থই না পায় তাহলে হাওড়ার ছোট ছোট কল-কারখানার শ্রমিকেরা কি বলবে ? সেখানে তারা ত্রিশ টাকা সপ্তাহ পায়।

বলদেও সিং বলল, আপনি অবাক হচ্ছেন। বেশ হিসাব করুন। আমরা যে কমিশন পাই তা সারাদিনের ডিউটির ওপর। আমাদের ডিউটি ভোর চারটে থেকে রাত বারোটা।

আমি হিসেব করলাম মোট কুড়ি ঘণ্টা। চল্লিশ টাকা রোজ হ'লে ঘণ্টায় ছু-টাকা। সাধারণভাবে আটঘণ্টার জন্য ষোল টাকা।

বলদেও সিং বলে চলল, এবার খরচের কথা ধরুন। আমরা পাঞ্জাবীরা সারা জীবনে যা উপায় করি তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ

শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই খরচ করি। বিশেষ ক'রে যারা এই ড্রাইভারী লাইনে আছি।

জগতার সিং মদের খালি বোতলটা খাটিয়ার নিচে রেখে দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'ল, বলদেও সিং খাই-খরচের যা হিসেব দিচ্ছে হয়ত তা সত্যি। কিন্তু আমার মনে হয় এতটা খরচ অধিকাংশই কু-খাদ্যের জন্য। নইলে আমাদের মধ্যে খেয়ে ফতুর হয়েছে এমন বাঙালীর সংখ্যা গণ্ডা গণ্ডা। অথচ তাদের মধ্যে অনেকেরই কোন নেশাভাঙ ছিল না। তবু শুধু মাছ-মাংস আর কোপ্তা-কালিয়া করেই নিঃস্ব হয়ে গেছে। এই তো সেদিন দুলালের বাবা মারা গেলেন। হ্যাঁ, খেতে পারতেন বটে ভদ্রলোক। যেমন আয় তেমনি ব্যয়। রোজ যা আয় করতেন সেদিনই তা শেষ করে দিতেন। এই করে করে যেদিন মারা গেলেন দুলাল তখন বাবার কাঠের ক্যাসবাক্স ভেঙ্গে দেখল মাত্র সাঁইত্রিশটা পয়সা পড়ে আছে। অথচ আগের দিন সাত সাতটা ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেয়েছেন দুলালের বাবা।

অবশ্য দুলালের বাবার উদাহরণ দিয়ে বলদেও সিংএর খাওয়া খরচা সম্পূর্ণ বাজে খরচা এ কথা আমি বলতে পারছি না। তবু একেবারে চেপে যেতেও পারছি না। নিজের চোখে দু-ভাইকে বোতলশুদ্ধ মদ খেতে দেখলাম। ব্যাপারটা আমার চোখে খুবই বিসদৃশ্য ঠেকলো। আমরা বিড়ি সিগারেটও এমন ভাবে দাদা-ভাইএ খেতে পারবো না। তা মদ তো দূরের কথা। কিন্তু একটু আগে দুই সিং মিলে সেই কাণ্ডটাই তো করলো। আমার সবচেয়ে বাজে লাগল জগতার সিং-এর মত ছেলেমানুষকে বোতল শুদ্ধ মদ গলায় ঢালতে দেখে। ওই তো অতটুকু ছেলে। বলদেও সিং নিজেই তো ওর বয়সের যা হিসেব দিলে তাতে করে বড়জোর পনের-ষোল বছর হবে। এই বয়সে মদ খাওয়া তো কম নয়। তবে আর খরচ হবে না কেন?

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বলদেও সিং বলল, সারা জীবন এইভাবে খরচ করে যদি সঞ্চয়ই না হল তবে আর পরিশ্রম করে লাভ কি বলুন। তার চেয়ে ট্রান্সপোর্টই ভাল।

আমি প্রশ্ন করলাম, এতে কি খাটুনি কম?

বলদেও বলল, অনেক কম। কনট্র্যাক্ট বেসিসে কাজ। মাল বোঝাই কর আর নামিয়ে দাও। কোন তাড়া নেই। পাবলিকের গালাগালি নেই। মালিকের কাছে কোন কৈফিয়েৎ দিতে হয় না। এই যে এতবড় এ্যাক্সিডেণ্ট হ'ল এতে আমার দায়িত্ব এক আনাও নয়।

আমি অবাক হলাম। সেকি! এত যে ছাগল মারা গেল, গাড়ীর যে এত ক্ষতি হ'ল, তবে এ সবের দায়িত্ব কার?

—গাড়ীর দায়িত্ব ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর। আর ছাগলগুলোর কথা বলছেন। ওগুলোকে তো আর আমি ইচ্ছে করে মেরে ফেলি নি। তাছাড়া গাড়ী কোথায় কখন এ্যাক্সিডেণ্ট করবে সে কথা কেউ বলতে পারে না। তবে আর আমার দোষ কোথায় বলুন?

আমি বললাম, তা ঠিক। তবে ড্রাইভারদের সম্বন্ধ্যে অনেকে অনেক কথা বলে। সে সব কথা আমার বলা উচিত হবে না। তবু......

বলদেও সিং মাথার চুলে চিরুনি দিতে দিতে বলল, বলুন না বাবু কি বলবেন। আপনি মদ খাওয়ার কথা বলছেন তো?

আমি স্পষ্ট করে কিছু না বলে আমতা আমতা করে বললাম, হ্যাঁ। মানে অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ হয়েছে কিনা যে নেশা করে গাড়ী চালাতে গিয়েই নাকি এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে।

বলদেও সিং দোষ স্বীকার করে বলল, কথাটা মিথ্যে নয়। তবে এ লাইনে নেশা করাটা কখনো কখনো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এই আমার কথাই ধরুন। মদ না খেলে আমি একটুও ঘুমোতে পারব না। আর না ঘুমোলে গাড়ীও চালাতে পারব না।

আমি বললাম, এ তো অভ্যাসের কথা। কোন জিনিষে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা ছেড়ে দেওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠে।

—হয়ত তা ঠিক। তবে অভ্যাস আসে প্রয়োজন থেকে। আমাদের মদ খাওয়ার প্রয়োজন আছে।

আমি এ যুক্তি কিছুতেই মানতে পারলাম না। রামকেষ্টপুরের গোবরাদার কথা মনে পড়ছে। হাফপ্যান্ট প'রে গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরেছে। আজ পঞ্চাশ বছরেও একই ভাবে ধরে আছে। কিন্তু কোনদিন মদ তো দূরের কথা একটা বিড়ি সিগারেটও খেতে দেখি নি। তবে আর প্রয়োজন কথাটা আসছে কেন?

আমি কিন্তু তর্কের মধ্যে গেলাম না। বলদেও সিংকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এই জগতার সিং-এরও কি নেশা করার প্রয়োজন আছে?

বলদেও চট করে কোন উত্তর দিল না। আড়চোখে ভাই-এর দিকে তাকাল।

আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে খাটিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি, জগতার সিং ঘুমিয়ে পড়েছে। এই তো একটু আগে দেখলাম, শোবার ব্যবস্থা করছিল। এরই মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

বলদেও সিং ভাই-এর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের দৃষ্টি করুণ বিষণ্ণ। সারা মুখে মমতা মাখানো।

আমার মুখে আর কথা নেই। আকাশ আগের থেকে আরও বেশী পরিষ্কার দেখাচ্ছে। ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। আকাশ থেকে শেষ রাতের আলো এসে জগতার সিং-এর মুখে পড়েছে। জগতার সিং মদ খেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

পাঞ্জাবের কোয়ালামপুর গ্রামের ইন্দর সিং আজ তেষট্টি বছর বয়সে ড্রাইভারী জীবন শেষ করে হাতে কোদাল তুলে নিয়েছে। পৈতৃক যেটুকু জমিজায়গা আছে তাতেই চাষবাস করে। কোনরকমে সংসার

চালাতে তো হবে। আট বছর বয়সে বাবা জগিন্দর সিং-এর হাত ধরে কলকাতায় গিয়েছিল। ফিরে এসেছে তেষট্টি বছরে। এতোগুলো বছরের ড্রাইভারী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েও দু'ছেলেকে সেই ড্রাইভারী লাইনে ঠেলে দেবার আগে অনেক কিছুই ভেবেছে ইন্দর সিং। কিন্তু বৃথাই ভাবা। ভেবে কিছু কাজ হয় না। ভাবতে ভাবতেই কাজ চলে যায়। তাছাড়া ইন্দর সিং বোঝে, তার নিজের রক্তের মধ্যে ড্রাইভারের বীজ রয়েছে। সেই বীজ নিয়েই জন্মেছে বলদেও সিং আর জগতার সিং।

ইন্দর সিং সারাজীবন তো কলকাতাতেই পড়ে রইল। দু-ছেলে আর বউকে প্রথম প্রথম কিছুদিন নিজের কাছে রেখেছিল। কিন্তু তাতে লোকসান ছাড়া লাভ হয় নি। দু-দুটো সংসার হয়ে যাচ্ছিল। খরচে কুলোতে না পেরে আবার সবাইকে দেশে ফিরিয়ে দিয়ে নিজে একা কলকাতায় রয়ে গেল। ফলে দেখাশোনার অভাবে প্রথম বয়সে ছেলেদের লেখাপড়া হ'ল না। প্রথমে বড় ছেলে বলদেওকে নিজের কাছে এনে নিজের বাসেই কণ্ডাকটারি শিখিয়েছিল। তারপর ড্রাইভারী। শেষে ড্রাইভারী শেষ করে দেশে ফিরে গিয়ে ছোট ছেলে জগতারকে পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়।

চার পুরুষ ধরে সেই একই দৃশ্য। পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় আসা। আবার কলকাতা থেকে পাঞ্জাবে ফিরে যাওয়া। সেই একই জীবন। প্রথমে কণ্ডাকটার, পরে ড্রাইভার। কিন্তু এতগুলো বছর দিয়ে আর এতগুলো জীবন দিয়ে আজও সংসার থেকে অভাবকে তাড়ানো গেল না। নইলে যার দু-দুটো ছেলে কলকাতায় চাকরী করছে সেই ইন্দর সিং-এর আজ কিসের ভাবনা? কেন তাকে এই তেষট্টি বছর বয়সেও সংসারের হাল ধরতে কোদাল হাতে নিতে হয়? কেন তার বারো বছরের ছেলেকে ড্রাইভারী জীবনের দুঃখের মধ্যে ঠেলে দিতে হয়?

জগতার সিং ঘুমোচ্ছে। বলদেও সিং তাকে মদ খাইয়ে ঘুম

পাড়িয়ে রেখেছে। আহা ঘুমোক। সারাদিন ওর ওপর অনেক ধকল লেগেছে। ওইটুকু ছেলে অত ধকল সইতে পারবে কেন ?

আজ সকালে সম্বলপুর থেকে ভোর পাঁচটায় লরি ছেড়েছে বলদেও। জগতার সিং দাদার পাশে বসে ঢুলছিল। কাল রাতে মদ পাওয়া যায়নি। তাই দুজনের কারোরই ভাল ঘুম হয় নি। তবু বলদেও সিং তার সুর্মা লাগানো চোখ দুটোর তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে এত বৃষ্টির মধ্যেও বেশ স্বচ্ছন্দেই গাড়ী চালাচ্ছিল। হঠাৎ কি যে হ'ল। একটা বাঁকের মুখে ব্রেক কষে স্টিয়ারিং ঘোরাতে গিয়ে বলদেও সিং বুঝতে পারল ব্রেক ধরছে না। গাড়ীতে তখন পঞ্চাশ মাইলের মত স্পীড্। বলদেও বাম হাতের কনুই দিয়ে জগতারকে ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে উঠল। হতভম্ব জগতার কিছু বুঝে ওঠবার আগেই বলদেও ডানহাতে ষ্টিয়ারিং ধরে বাম হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দরজার দিকে পাঠিয়ে দিয়ে ডান দিকের দরজা খুলে ফেলল। গাড়ীর মাথায় ত্রিপল ঢাকা দিয়ে মনুয়া এতক্ষণ বৃষ্টির জল আটকাচ্ছিল। গাড়ীর এলোমেলো গতি দেখে ত্রিপল সরিয়ে বাইরে আসতেই বৃষ্টির জল তার চোখে মুখে এসে লাগল। এমন সময় বলদেও চিৎকার করে মনুয়াকে ওপর থেকে লাফ দিতে বলল।

মনুয়া রাঁচির ছেলে। জাতে সে সাঁওতাল। ছেলেবেলা থেকে গাছে চড়তে ওস্তাদ। সে এ গাড়ীর একমাত্র কুলি। বলদেও-এর চিৎকার শুনে মাথার ওপরেই ভাগ্যক্রমে একটা গাছের ডাল পেয়ে সেটা ধরে ঝুলে পড়ল সে।

এদিকে তখন বাঁকের মুখেই একটা বাম্পারের সামনে এসে

প্রাণপণে হ্যাণ্ডব্রেক টেনে ধরল বলদেও। কিন্তু না। গাড়ী তখন আউট অফ্ কন্ট্রোল। বাম্পারে ধাক্কা লেগে গাড়ী তখন অনেকটা লাফিয়ে সোজা উল্টে গিয়ে একটা পুকুরে পড়ল।

জগতার সিং তার আগেই জলে ঝাঁপ দিয়েছে। বলদেও মুখ থুবড়ে জলে গিয়ে প'ড়ে মুহূর্ত মধ্যে ডুবে৷ সাঁতার দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়েই পাঁকে আটকে গেল। তারপর দু-হাতে পাঁক ঠেলে ঠেলে কোন রকমে মাথা উঁচিয়ে জলের ওপর ভেসে উঠল।

কিন্তু এতবড় বিপদেও নার্ভাস হয় নি বলদেও। ড্রাইভারী জীবনে এ্যাক্সিডেন্ট হ'ল চব্বিশ ঘণ্টার সংগী। তাকে এড়িয়ে যাওয়ার থেকে মেনে নেওয়াই ভাল। কেননা হাজার সাবধান হলেও কপালে এ্যাক্সিডেন্ট থাকলে তা হবেই।

সারা দেহে পাঁক মেখে বলদেও আগে ছুটল জগতার সিং-এর দিকে।

নিরাপদেই নিজেকে রক্ষা করছে জগতার। ভিজে জামা কাপড়েই হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে দাদার অবস্থা দেখে সে হাউমাউ করে উঠল। তারপর জলের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে বলদেও সিং-এর পাঁকশুদ্ধ দেহটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

বলদেও সিং-এর ভিজে চোখ আরও ভিজে উঠল। একটি মাত্র ভাই তার। দাদার ওপরেই ষোল আনা ভরসা করে পড়ে আছে। সে জানে না কি তার ভাবনা, কি তার ভবিষ্যৎ। বাবা বাড়ী গিয়ে এক নিকট আত্মীয়ের সংগে কলকাতায় দাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে দাদাই তার ভবিষ্যৎ। দাদাই তার সবকিছু।

তবু বলদেও নিজের দুর্বলতা বিন্দুমাত্র ভাই-এর কাছে প্রকাশ করে না। এতবড় বিপদের মুখ থেকে ভাইকে বাঁচানোর আনন্দে চোখের জল তার কিছুতেই বাধা মানতে চাইছে না। কিন্তু না। সে কাঁদবে না। তার দেহে রয়েছে ড্রাইভারের রক্ত। তার বুকে

রয়েছেন গুরু নানক। জয় গুরুজীর জয়। জয় নানকের জয়।

জগতার সিং ঘুমোচ্ছে।

বলদেও তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, ভাগ্যিশ এখানে এত রাতেও এক বোতল মদ পাওয়া গেছে। নইলে জগতার সিং-কে কিছুতেই ঘুম পাড়ানো যেত না। আর জগতার সিং না ঘুমোলে বলদেও সিং কিছুতেই শান্তি পেত না।

আজ ত্রিশে জুন। রায়পুর থেকে ভোর ছটায় গাড়ী ছাড়ল। আমি আবার যথারীতি ব্যানার্জীর গাড়ীতে ফিরে এসেছি। সত্যি-কথা বলতে কি ব্যানার্জীর গাড়ীটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে লষ্ট ষ্টিক ব'লে একটা ইংরেজী গল্প পড়েছিলাম। তাতে জড় পদার্থের প্রতি মানুষের আকর্ষণ যে কত তীব্র হ'তে পারে তার প্রমাণ আছে। আমার কাছে অন্য গাড়ীর তুলনায় এই গাড়ীটিই যেন বেশী আকর্ষণীয়। যদিও সচলতাই গাড়ীর ধর্ম তবু গাড়ী নিজের থেকে চলতে পারে না। তাই আসলে সে অচল, অর্থাৎ জড় পদার্থ। এই গাড়ীটিতে প্রথম থেকেই আমি চেপে আসছি। তাই সাতদিনের এই পথ চলায় এটি আমার গাড়ীই হয়ে গেছে। বাজোরিয়া সাহেবের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বলেছিলেন, আপনার গাড়ী ব্যনার্জী চালাবে। হিন্দমোটরে প্রথম গাড়ীতে ওঠার সময় শিউশংকর মিশ্র বলেছিলেন, এই আপনার গাড়ী। পথে আসতে আসতে আমি নিজেই কত বার আমার গাড়ী আমার গাড়ী বলে একে চিহ্নিত করেছি। এ গাড়ীর জন্মের পর আমার সঙ্গেই এর প্রথম অন্তরঙ্গতা। এই ক'দিনে গাড়ীটির সঙ্গে অদৃশ্য এক বন্ধনে যেন জড়িয়ে পড়েছি। আমার হৃদয়লতিকা যেন

এই অচেতন গাড়ীটিকে স্নেহের ললিত বেষ্টনে সুন্দর করে বেঁধেছে। যখন এ গাড়ী ছেড়ে আমি মুক্তি ঝা-র গাড়ীতে উঠেছি তখন প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে এ-তো আমার গাড়ী নয়।

আজ প্রথম থেকেই গাড়ী বেশ জোরে চলছে। এখন আমাদের গন্তব্যস্থল দেওড়ি। দূরত্ব একশো চল্লিশ কিলোমিটার।

গতকাল সারা দিনরাত বৃষ্টির মধ্যে কেটেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের কোথায় যেন একটা অদৃশ্য যোগ আছে। স্যাঁত-সেঁতে ভিজে দিনে মানুষের মনও যেন ভিজে যায়। বর্ষাকালে দেশলাই কাঠি সহজে জ্বলতে চায় না। বৃষ্টিতে আমাদের মনও কাল সহজে জ্বলতে চায়নি। জগদীশ ঝা আর তার বউ সেই যে কাল সকালে কটকে চলে গেল তারপর থেকেই আমার মনের আকাশে একটা বিষণ্ণ কালো চিন্তার মেঘ এসে ধীরে ধীরে ছেয়ে গেল। এ চিন্তা ঠিক সুপষ্ট নয়। কেমন অস্পষ্ট ছায়া ছায়া। এক নিরবয়ব অনুভূতি। তারপর যত বেলা বেড়েছে এ অনুভূতির বীজ ততই হৃদয়ের আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তি ঝা-র গল্প শুনতে শুনতে দেহমন এতই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে গাড়ীতে নড়ে-চড়ে বসতেও ইচ্ছে করছিল না। এর সংগে অবিরাম বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ যেন কালের ঘণ্টার মত বাজতে বাজতে আমার মনের হাত ধরে তাকে অতীতের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

রাতের বেলায় সেই অতীত, উইলশন পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে আমাকে পেয়ে যেন তার সম্পূর্ণ মূর্তি ধরে আমার সামনে হাজির হয়েছিল। কুশন ঝা, ভগবতী প্রসাদ বাঙ্কা, সুন্দরী দেবী, জীবন বাবু, মারাঠী ড্রাইভার কেশব, মিস্টার অমিয় মুখার্জী, মিসেস্ উইলশনের বাবা, রবার্ট লুই এর অসুস্থা মা এরা সবাই আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল।

আজ আকাশ কেটে গেছে। পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশ সকালের কাঁচা রোদ্দুরে ঝকঝক করছে। ভিজে মাটির বুক

থেকে গত রাতের বৃষ্টি আবার আকাশের বুকে ফিরে যাচ্ছে। ভারি সুন্দর লাগছে আজকের পরিবেশ। ভাল করে সাবান মেখে স্নান করার পর দেহ যেমন তাজা ও পরিষ্কার দেখায়, এখন পৃথিবীকেও তেমনি দেখাচ্ছে। গতকাল সারা দিন-রাতে প্রকৃতির দেহের সমস্ত ময়লা যেন বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে।

ব্যানার্জী মুখ নিচু করে গাড়ী চালাচ্ছে। গতরাতের সেই লজ্জা এখনও তার চোখে-মুখে লেগে আছে। বুঝতে পারছি গতরাতে আমার অভুক্তির জন্য ব্যানার্জী নিজেকেই দায়ী করেছে।

ব্যানার্জীর মুখটা দেখে আমার কেমন মায়া হ'ল। কত বয়স হবে ব্যানার্জীর! বোধহয় আমার সমান সমান। কথায় খুব সামান্য পূর্ব বাংলার টান আছে। পরণে লুঙ্গি আর হাফহাতা সার্ট। সঙ্গে জিনিষপত্র বলতে সতরঞ্চ মোড়া একটা ছোট মোট। কেওনঝড়ের হোটেলে তাকে সামান্য তরকারী দিয়ে ভাত খেতে দেখেছি। অথচ মাছের দাম ওখানে বেশ সস্তাই ছিল। ব্যানার্জী ইচ্ছে করলেই একপিস মাছ কিংবা অন্য কোন তরকারী নিতে পারত। কেন নিল না। বোধহয় বেশী তরকারী পছন্দ করে না। কিন্তু মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। এতেও কি তার অরুচি! নাকি পয়সার অভাবে ইচ্ছে থাকলেও বেশী তরকারী কিনতে পারেনি। খুব স্বাভাবিক। কটা টাকাই বা রোজগার করে। কলকাতা থেকে বোম্বাই। এর জন্য বরাদ্দ চারশো বার টাকা। পথে সাতদিনের খরচ আছে। তাছাড়া বোম্বাই থেকে কলকাতা ফেরার ট্রেন ভাড়াও এই সংগে যোগ করা আছে। সেও প্রায় ফেরার পথের রাহা খরচ মিলিয়ে আশী-নব্বই টাকা। সব মিলিয়ে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে দু'শো টাকার মত হাতে নিয়ে কলকাতায় ফিরবে। তারপর আবার সেই ছোটাছুটি। একবার হিন্দমোটর আর একবার আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী। ইউনিয়নের নিয়ম আছে, ড্রাইভারের ওয়েটিং লিস্টে নাম তুলতে হবে। প্রায় আটশো ড্রাইভার পালা করে চান্স পাবে। যারা

কেবলমাত্র এই কনভয়ের উপর ভরসা করে থাকে তাদের অবস্থা আরও খারাপ। একটা কনভয়ে চান্স পাবার .পর ফিরে এসে আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। যদি সাপ্লাই ভাল থাকে তবে কখনও কখনও মাসখানেকের মধ্যে আবার চান্স পাওয়া যায়। নইলে তিন মাসও পেরিয়ে যায়। এদিক দিয়ে ব্যানার্জীর কিছুটা সুরাহা আছে। সে আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর সেল্‌ফ ড্রাইভার। যদিও যে কোন ড্রাইভারকেই ইউনিয়নের তালিকাভুক্ত হতেই হবে তবুও রক্ষে এই যে সেল্‌ফ ড্রাইভার হলে চান্স অনেক বেশী থাকে। আসলে এ লাইনে যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার তা হ'ল বিশ্বাস আর দায়িত্ব সচেতনতা। অবশ্য গাড়ীর চালক হিসাবে তাকে দক্ষ হতেই হয়। কনভয়ের গাড়ী সবসময়েই দলবেঁধে যায় না। কখনও দু'তিনটি আবার কখনও একা একখানা গাড়ী বা চেসিজ নিয়ে নাগাল্যাণ্ড কি আসাম, কাশ্মীর কি আগরতলা যেতে হয়। তখনই কোম্পানী দক্ষ আর বিশ্বাসী ড্রাইভার খোঁজে। সেল্‌ফ ড্রাইভারকে সাধারণতঃ আর পাঁচজন সাধারণ ড্রাইভারের তুলনায় বিশ্বস্ত হতেই হয়।

কনভয়ের পথে পথে একজন ড্রাইভারের পক্ষে একখানা গাড়ী নিয়ে যাবার বিপদ যেমন পদে পদে তেমনি বাড়তি কিছু আয়ের সুযোগও পাওয়া যায়। এ আয়ের লোভ সামলানো গরিব ড্রাইভার-দের পক্ষে খুবই শক্ত। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ কিংবা যে কোন প্রদেশেই শহর পেরোলেই গ্রাম। আর গ্রাম মানেই অভাব। খাদ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব, যান-বাহনের অভাব। কনভয়ের গাড়ী দেখলেই পথ চলতি গ্রামের মানুষ তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। যদি কোন ড্রাইভার দয়া করে তাদের গন্তব্যস্থলে একটু পৌঁছে দেয়। কাজের মানুষ তারা। অনেক সময়ও যেমন বাঁচবে। কাজেরও তেমনি সাশ্রয় হবে। অবশ্য বিনিময়ে তারা কিছু ভাড়া দেবে। ভাড়া! নামেই ভাড়া। যৎসামান্য। রাস্তায় চা-পান-বিড়ির খরচাটা ওঠে। তাই লাভ। যাত্রী বেশী হলে

লাভও বেশী। আর লাভ বেশী হলে মেজাজও ভাল থাকে। বাইরে বেরিয়ে এই লাভের পয়সায় সংসারের কিছু টুকিটাকি জিনিষও কেনা যায়। সস্তা আয়না, পাউডার, বাসন, ছেলে-মেয়েদের খেলনা, দু-একটা জামা-কাপড়, একশিশি গন্ধতেল, বিছানার চাদর আরও কত কি।

কনভয়ের ড্রাইভারদের পক্ষে গাড়ীতে যাত্রী তোলা ঘোরতর অন্যায়। অন্যায় আরও অনেক কিছু। কত আইন। কত নিয়ম-কানুন। অটোমোবাইল এশোসিয়েসনের নিয়ম, ড্রাইভারস্ ইউনিয়নের নিয়ম, এজেন্ট কোম্পানীর নিয়ম, কনট্রাক্টারের নিয়ম, ট্রাফিকের নিয়ম, রাস্তার নিয়ম। এ সবের ওপর মোটর ভিকলস্ এ্যাক্ট তো আছেই। এতো নিয়মের মধ্যেও অনিয়ম হয়। আদালতে ধর্মপুস্তক হাতে নিয়ে সত্যের শপথ গ্রহণ করেও পেটোয়া সাক্ষী যেমন গড় গড় করে মিথ্যে বলে যায় কনভয়ের কিছু ড্রাইভারও তেমনি মাঝে মধ্যে অনিয়মের শিকার হয়ে পড়ে।

কিন্তু নিয়ম মেনে চলাই একটা দায়িত্ব। আর সে নিয়ম ভাঙলে আরও দায়িত্ব। তাই পকেটে ইউনিয়নের রুলস্‌বুক নিয়ে সেই রুলস্ ভংগ করতে ড্রাইভারদের বুক কাঁপে। যাত্রী নামিয়ে পয়সা নিতে গিয়ে হাত কেঁপে ওঠে তাদের। কিন্তু নেসেসিটি হ্যাজ নো ল। প্রয়োজন আইন মানে না। অভাবের সংসারে প্রয়োজনের সুদীর্ঘ তালিকা আইনের তালিকা ছাপিয়ে চোখে ভেসে ওঠে। তখন নিয়ম নেই, আইন নেই, শাস্তির ভয় নেই। তখন শুধু অভাব আর প্রয়োজন। প্রয়োজন আর অভাব।

মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্রের সীমানার কাছে এসে ব্যানার্জী গাড়ী থামাল। ঘড়িতে সবেমাত্র দশটা। আজ রবিবার। কলকাতায় থাকলে ছুটির দিনে এমন সময় মুড়ি আর তেলেভাজা দিয়ে ব্রেকফার্স্ট সারছি। অথচ এখানে এখনই লাঞ্চ। হাতে একঘণ্টা সময়। এরই মধ্যে স্নান খাওয়া সেরে নিতে হবে।

কাল তাড়াতাড়িতে স্নান করি নি। আজ করতেই হবে। আশেপাশে জলের কল খুঁজলাম। কিন্তু সুবিধে মত তেমন জায়গা পেলাম না। ব্যানার্জী সংগে সংগে ঘুরছে। বলল, চলুন কাছাকাছি কোন পুকুর আছে নাকি দেখি। তাহলে আমিও একটা ডুব দিয়ে নোব।

যুক্তিটা মন্দ লাগল না। লুঙ্গি পরে গামছা গায়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। ভাগ্য ভালো। বেশী দূরে যেতে হল না। রাস্তার ধারে জঙ্গলের একটু ভেতরে পাশাপাশি দুটো পুকুর। কালকের বর্ষার জলে টল টল করছে।

স্নান সেরে উঠতেই খিদেটা মোচড় দিয়ে উঠল। কাল রাত থেকে খাই নি। আজ সকালে দুখানা সিঙাড়া আর এক কাপ চা খেয়ে গাড়ীতে উঠেছি।

এগারোটা পনের। গাড়ী দেওড়ী থেকে নাগপুরের দিকে যাত্রা করল। আজ খিদের চোটে পেট টাইট করে খেয়েছি। কাল রাতে নানা কারণে ঘুম হয় নি। তাই এখন মাথায় জল আর পেটে ভাত পড়তেই চোখ জোড়া আপনা থেকেই বুজে আসতে চাইল। কিন্তু গাড়ীতে ঘুমোতে আমার ভয় লাগে। মনে হয় চোখ বুজলেই গাড়ী এ্যাক্সিডেণ্ট করবে। জোর করে চোখের পাতা টান করে আধশোয়া ভঙ্গিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ পেরিয়ে মহারাষ্ট্রের রাস্তা

দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। কিন্তু রাস্তার বুঝি জাত নেই। সর্বত্রই সে এক। তার চেহারা এক। তার ধর্ম এক। পাথর কিংবা ইটের খোয়ার ওপর কালো পিচের আস্তরণে মোড়া তার দেহ। হাজার হাজার মাইল দূরত্বের হিসেব নিয়ে নিজেকে সে অজগরের মত বিছিয়ে রেখেছে। কোথাও সে রাজপথ, কোথাও সে জনপথ। কিন্তু সর্বত্রই সে পথ। ভারতের বুকে বারোলক্ষ ষাট হাজার বর্গ-মাইল জায়গা জুড়ে মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে শুধু পথ আর পথ। সমতল আর বন্ধুর পথ। সংকীর্ণ আর প্রশস্ত পথ। সরল আর বক্রপথ।

না। আর সম্ভব নয়। পেটভর্তি খাবার আর গাড়ীর এই গতির দোলানীর সংগে লড়তে পারলাম না। রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হল। হারিয়ে গেল পথ। হারিয়ে গেল গাড়ী। চোখ বুজে ঘুমন্ত রাজপথের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলাম।

ঘুম ভাঙল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। আর উঠেই চোখে পড়ল অপূর্ব এক দৃশ্য। যেখান দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে সেটা বোধহয় পাহাড়ী জায়গা। মাঝে মাঝেই রাস্তা হঠাৎ হঠাৎ উঁচু হয়ে আবার অনেকটা নীচে নেমে গেছে। গাড়ী ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। আমরা দক্ষিণে যাচ্ছি। দরজা দিয়ে পশ্চিমে তাকিয়ে আছি। দূরে দূরে ছোট বড় কয়েকটা পাহাড়। ঠিক পাহাড় বললে ভুল হবে। বলা উচিত বড় বড় টিবি। নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ। টিবির মাথার ওপর বিদায়ী সূর্যের ম্রিয়মান মুখ চোখে পড়ল। কাল এমন সময় সে সকলের অগোচরে কখন কোথা থেকে যে বিদায় নিয়েছে জানি না।

আজ দেখা হ'ল। কনভয়ের চলমান গাড়ীতে বসে সূর্যকে দেখছি। অস্ত যাবার জন্য আজ সে বড়ই ব্যস্ত। আমার ভাবনা হ'ল গাড়ী চলতে চলতে হঠাৎ যদি কোন টিবির আড়ালে পড়ে যাই

তাহলে সূর্যাস্ত দেখার এমন সুযোগ নষ্ট হবে। চোখের পলক না ফেলে টিবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ একটা বাচ্ছা ছেলেকে দেখতে পেলাম। টিবির ওপর দিয়ে সে ছুটছে। হাতে তার কিছু একটা রয়েছে। দূর থেকে মনে হ'ল একটা গাছের ছোট ডাল। টিবির নীচু পথে সে কখনও কখনও হারিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই আবার দেখতে পাচ্ছি। ছেলেটি পশ্চিম থেকে পূবদিকে ছুটে আসছে। তার পেছনে আকাশের রক্তিম পর্দা। এই মুহূর্তে মনে হল, ছেলেটি না ছুটে কেবলমাত্র ছোটার ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকুক। তাহলে প্রকৃতির বুকে জীবন্ত এক স্থির চিত্র আঁকা হয়ে যাবে। নিজেকে খুব বোকা বলে মনে করলাম। একটা ক্যামেরা আনলে কি ভালই না হত।

উঁচু-নীচু রাস্তা ধরে ব্যানার্জী গাড়ী চালাচ্ছে। ওদিকে ছেলেটিও একভাবে ছুটে চলেছে। ক্রমশঃ সে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'ল। তার পরণে ছোট কাপড়ের টুকরো। খালি গা। এবার ছেলেটা আমার গাড়ীর দিকে তাকিয়ে গাছের ডালটা উঁচু করে ধরে চেঁচাতে লাগল। মনে হল, আমাদের যেন ডাকছে।

ছেলেটির চিৎকার শুনে ব্যানার্জী এতক্ষণে তাকে দেখতে পেল। কিন্তু কোন গুরুত্ব না দিয়ে যেমন গাড়ী চালাচ্ছিল তেমনিই চালাতে লাগল।

ছেলেটি খুব কাছাকাছি আমাদের রাস্তার সামনের দিকে অনেকটা দূরে এসে ছোটা বন্ধ করল।

আমার আগে আমাদেরই আরও কয়েকটা গাড়ী তাকে অতিক্রম করে গেল।

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমাদের গাড়ী অনেকটা ঘুরে তার কাছাকাছি যেতেই সে হাত দেখাল।

ব্যানার্জী গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি গাড়ী থামাবার

নির্দেশ দিলাম।

এই প্রথম আমার নির্দেশ পেয়ে ব্যানার্জী সামান্য পিছিয়ে গাড়ী নিয়ে একেবারে ছেলেটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বছর বারো তেরো বছরের গ্রাম্য মহারাষ্ট্রীয় ছেলেটি আমায় দেখে মুক্তোর মত ছোট দাঁতগুলো বার করে হেসে উঠল।

আমার কি মনে হ'ল। গাড়ীর দরজা খুলে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ছেলেটি কোমরের পেছন থেকে সেই লুকানো গাছের ডালটা বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। পাতাশুদ্ধ একগোছা কৃষ্ণচূড়া ফুল।

আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম।

ছেলেটি ইংগীতে আমাকে ফুলগুলো নিতে বলল।

আমি সাহস পেয়ে ফুলগুলো হাতে নিলাম। টাটকা ফুল। সবেমাত্র গাছ থেকে পেড়ে এনেছে।

ছেলেটির মুখ খুশীতে ভরে গেল।

ব্যানার্জী বলল, ছেলেটির হাতে দু-চার আনা পয়সা দিতে।

আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা টাকা বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

ছেলেটি পরম লজ্জায় মাথা নীচু করে নিল।

আমি জোর ক'রে ওর হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়ে আবার গাড়ীতে চড়ে বসলাম।

ব্যানার্জী গাড়ী ষ্টার্ট দিলে ছেলেটি নিঃশব্দে হাত নেড়ে আমায় বিদায় জানাল।

আমার চোখে জল এসে গেল। ওরই দেওয়া কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো নাড়াতে নাড়াতে ভাবতে লাগলাম, আমি ধন্য। ধন্য আমার মনুষ্য জন্ম। ধন্য আমার ভাগ্য। আর সার্থক আমার এ ভ্রমণ যাত্রা।

রায়পুর থেকে গাড়ী ছাড়ার সময় শিউশংকর মিশ্র বলেছিলেন যদি কোন কারণে পথে আমাদের দেরী হয় তবে আজ রাত্রে নাগপুরে গাড়ী হল্ট করবে। আর তা না হলে সোজা বোরগাঁও চলে যাওয়া হবে।

আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। রাস্তায় কোন অঘটনই ঘটে নি। সুতরাং যথাসময়ে বোরগাঁও পৌঁছানো গেল।

কলকাতার বহু কাগজেই আজকাল রাশিচক্র সম্বন্ধিয় একটা সংবাদ থাকে। জ্যোতিষিতে বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক খবরের কাগজের এই বিশেষ রচনাটিতে কিন্তু আবালবৃদ্ধবণিতার নজর থাকে। মহারাষ্ট্রের পথের মাঝে যদি এই মুহূর্তে আজকের বাংলা খবরের কাগজখানা পেতাম তাহলে মেষ রাশির আজকের ফলটা একবার দেখে নিতাম। কারণ ঐ বিশেষ রাশিটি আমার। আর আজকে আমার ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে যার হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছে তিনি স্বয়ং মহম্মদ আলি।

আজ সকালে অন্যদিনের মত ব্যানার্জীর গাড়ীতেই যাত্রার শুভ সুচনা হয়েছিল। কিন্তু অল্পক্ষনের মধ্যেই তাতে বাধ সাধল একপাল গরু। রাস্তা জুড়ে অনেকগুলো গরুর দল একদিক থেকে আর একদিকে পার হচ্ছিল। ব্যানার্জী গাড়ী থামিয়ে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় পেছন থেকে মহম্মদ আলি আচমকা গাড়ী নিয়ে উড়ে এসে আমাদের সামনের পথ জুড়ে বসলো।

ব্যাপার কি! এভাবে ওভারটেক করে এগিয়ে যাওয়া কনভয়ের আইনে নেই। অথচ মহম্মদ একখানা দুখানা নয় পর পর দশখানা গাড়ী পার হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াল দেখে আমি আর ব্যানার্জী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে দরজা খুলে গাড়ী থেকে নেমে মহম্মদ আমার গাড়ীর দরজায় এসে আমায় মস্ত এক সেলাম্ ঠুকলো। আমার ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। সেদিন রাতে মহম্মদ মদ খেয়েছিল। আজ কি দিনের বেলাতেও মদ খেয়ে আবার আমার পা জড়িয়ে ধরবে নাকি! আমি উঁকি মেরে উইলশনের গাড়ীটা কতদূরে আছে দেখার চেষ্টা করলাম।

মহম্মদ আমায় ছেড়ে ব্যানার্জীকে আক্রমণ করল।

ব্যানার্জী সেদিন রাতে ধাক্কা খেয়ে আধমরা হয়েই আছে। এবার তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে মনে হ'ল বুঝিবা মারাই যাবে।

মহম্মদ ব্যানার্জীর সামনের দরজা খুলে বলল, এ বেনারজী। বাবুজীকা সামান-উমান হামারা গাড়ীমে লে চলো।

আমরা দুজনেই থ। এ আবার কি?

ব্যানার্জীর জীবনদীপ নেভার আগে দপ্ করে জ্বলে উঠল, বাজোরিয়া সাহেবের হুকুম আছে। বাবুজী আমার গাড়ীতে যাবেন।

মহম্মদ তেড়ে উঠল, আবে চোপ্। শালা চামচা। তুমারা সাহাবকো মারো গুলি। এ বাবুজী সব কইকা হ্যায়।

পরে আমার দিকের দরজা খুলে মাথা নীচু করে খুব ষ্টাইলের সংগে বলল, আইয়ে বাবুজী। ম্যায় কিসিকো ডরতা নেহি। ম্যায় খোদ সামান লে যায়ুঙ্গা।

এই বলে সে ছোঁ মেরে আমার ঝোলাটা হাতে তুলে নিল।

আমি হতভম্ব। একরকম বাকরোধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হল। কোন রকমে আমতা আমতা করে বললাম, ঠিক আছে। আমি নিশ্চয়ই যাবো তবে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মহম্মদ বাংলা হিন্দী মিশিয়ে বলল, কুছ নেহি। এমনি। আপনাকে হামার ভাল লেগেছে। আপনার সংগে গল্প করব।

আমার ধড়ে প্রাণ এল। একটু সহজ হয়ে বললাম, বেশ তো।

গল্প না হয় রাত্তিরে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে করা যাবে। এখন গাড়ীতে এভাবে......

আমার কথা শেষ হ'ল না। মহম্মদ বলল, নেহি বাবুজী। রাত হ'লে হামার জ্ঞান থাকে না।

আমি ব্যানার্জীর দিকে তাকালাম।

ব্যানার্জী, মহম্মদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মহম্মদ একটু মনমরা হয়ে বলল, কি বাবুজী। হামার কি কসুর বলুন। আপনি মুক্তি ঝা-র গাড়ীতে চাপলেন। তার ভাই-এর সংগে হোটেলে খানা খেতে গেলেন। আপনি উইলশন এর সংগে ওর রায়পুরের বাড়ীতে গেলেন। লেকিন হামার সংগে তুটো কথা বলবেন না? কিঁউ বাবুজী? আমি নেশা করি বলে?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আরে না না। তার জন্যে নয়।

মহম্মদ সংগে সংগে বলল, তব্?

আমার আর উত্তর জোগালো না।

মহম্মদ বলল, চলিয়ে বাবুজী।

আমার যাবার অপেক্ষা না করেই মহম্মদ ঝোলা নিয়ে নিজের গাড়ীতে রেখে সামনের দরজা খুলে অপেক্ষা করতে লাগল।

আমার পেছনে পর পর সবকটা গাড়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাচ্ছে। সামনে গরুর দল রাস্তা পার হয়ে কখন উধাও হয়েছে। আর দাঁড়িয়ে থাকলে সব ড্রাইভারদের কাছেই হাস্যাস্পদ হতে হ'বে। অগত্যা একরকম হাঁড়িকাঠে মাথা গলানোর মতই মহম্মদ আলির গাড়ীর পিছনের দরজার হাতলে হাত দিতেই সে বলল, নেহি বাবুজী। আপনি সামনে বসুন।

আমি স্কুলের গুড বয়ের মত মহম্মদ আলির কথা শুনে সামনের সিটে গিয়ে বসলাম।

মহম্মদ গাড়ী ছেড়ে দিল।

যেদিন প্রথম ব্যানার্জীর গাড়ীতে চেপে বালি রোড পার হয়ে আন্দুল রোডে পড়েছিলাম সেদিন ব্যানার্জীর গাড়ীর মন্থর গতি দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম। আর আজ মহম্মদ আলির পাশে বসে স্পীড্‌-ও-মিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে মৃত ডাইমিলারকে স্মরণ করলাম।

হায়! কি কুক্ষণেই মোটর গাড়ীর আবিষ্কার করেছিলেন সাহেব। আর যদিও বা করলেন সংগে সংগে যদি মহম্মদ আলির মত দূর্দান্ত ড্রাইভারের হাত থেকে আমার মত নিরীহ যাত্রীর আত্ম-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারতেন তাহলে অন্ততঃ সোজা হয়ে সীটে বসার ভরসাটুকুও পেতাম।

আজকের এ পথেও আপ এ্যাণ্ড ডাউন। মহম্মদ আলি উত্থানেও যেমন পতনেও তেমনি। মিটারের কাঁটা ষ্টার্টের মুখেই চল্লিশ পার হয়ে কনভয়ের বাঁধা গতির সীমা অতিক্রম করে গেছে। তারপর ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পঞ্চাশ...ষাট...সত্তর......।

আজ রাশিফল না দেখলেও আমার স্থির বিশ্বাস সেখানে আকস্মিক দূর্ঘটনায় প্রাণহানির আশংকার কথা নিশ্চয়ই লেখা আছে। অতএব হে হাওড়া নিবাসী বোম্বাই পথ-যাত্রী, এক্ষণে তুমি শেষবারের মত তোমার পৃথিবীকে দুই চক্ষু মেলিয়া দর্শন করিয়া লও।

আমরা দুজনেই চুপচাপ। মহম্মদ আলি এ কোন্‌ বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে আমাকে।

গাড়ী একটা বাঁকের মুখে পড়ল। আমি চোখ বুজে শক্ত কাঠ হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করলাম।

মহম্মদ আলি গাড়ী একেবারে শ্লো করে একটা বাম্পার ক্রশ

করল। তারপর গাড়ীর গতি আবার কনভয়ের নিয়মে এনে প্রথম কথা বলল, বাবুজী, আপনি কাহানি লেখেন ?

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

মহম্মদ বলল, আমায় মিশ্রজী সব বলেছেন বাবুজী।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি বলেছেন ?

মহম্মদ বলল, আপনি কিতাব লেখেন। আমাদের নিয়ে নাকি একটা কিতাব লিখবেন। তাই বোম্বাই যাচ্ছেন। কেয়া ইয়ে সাচ্ হ্যায় বাবুজী ?

আমি বুঝলাম, ভগ্নিপতির মুখ থেকে আমার বোম্বাই যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য বাজোরিয়া আর মিশ্রজীর ভায়া হয়ে মহম্মদ আলির কাছে গিয়ে পৌঁচেছে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে মহম্মদ আবার বলল, বাবুজী আপনি আমার কথা লিখবেন তো ?

আমি বললাম, কি লিখব বল ?

—আমার কাহানি। আমি খুনি বাবুজী।

আমি এতক্ষণে সিরিয়াস হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি সত্যিই কাউকে খুন করেছ মহম্মদ ?

মহম্মদ চিৎকার করে উঠল, আলবৎ। ম্যায় খুন কিয়া।

—কাকে ?

—আমার পিতাজীকে।

এতক্ষণ নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছিলাম। মহম্মদের কথা শুনে অর্ধেক রক্ত আবার শুকিয়ে গেল। মহম্মদ নিজের বাবাকে খুন করেছে।

ভয় গোপন করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়ী কোথায় ?

—বেনারস বাবুজী। আমার পিতাজী ওস্তাগর ছিল।

কথা বলতে বলতে মহম্মদ আবার সিগারেট ধরাল। ঘন ঘন সিগারেট খায় সে। গাড়ীতে উঠে প্রথমেই আমার অনুমতি নিয়ে

নতুন প্যাকেট খুলে সিগারেট খেতে সুরু করেছে। এরই মধ্যে প্যাকেট শেষ হয়ে গেল।

মহম্মদ বলল, আমার পিতাজীর দুবার সাদী হয়েছিল। আমার আম্মা মরে যেতে পিতাজী ফিন্ মাঁসীকে সাদী করল। মাসীর দুটা লেড়কা ভি ছিল। আমি বাড়ীর বড়া লেড়কা। পিতাজী আমাকে বহুত পেয়ার করত। লেকিন পেয়ার বহুত বুরা চিজ বাবুজী। আপনি যাকে পেয়ার করবেন সে আপনাকে দুখ দেবে, আপনার দিল টুটবে। পেয়ার কা আদমি হামেশা এইসাই হোতা। কি বাবুজী, আপনি তো কিতাব লিখেন। কেয়া ম্যায় ঝুট বোল রাহা হুঁ?

আমি কি উত্তর দেব। পেয়ার মানে প্রেম, মানে ভালবাসা। ভালবাসা দুঃখ দেয়, ভালবাসার বিফলতায় হৃদয় ভাঙে—এ তো চিরন্তন কথা, এ তো শাশ্বত সত্য।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে মহম্মদ আবার বলল, ও শালা উইলশন সাহেব আপনাকে কি কাহানি শুনাবে?

আমি মৃদু হেসে বললাম, উইলশন আমাকে গল্প শুনিয়েছে এ কথা তোমাকে কে বলল?

সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে গিয়ার চেঞ্জ করে মহম্মদ আলি বলল, আদমি চিনতে আমার কখনো ভুল হয় না বাবুজী। আমি জানি, উইলশন আপনাকে ঝুটা বাত বোলেছে।

আমি অবাক হলাম, ঝুটা বাত!

—হাঁ বাবুজী। উইলশন আপনাকে বোলেছে না যে ওর জানানাকে ও খুব পেয়ার করে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাস্তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মহম্মদ আমার দিকে তাকাল।

আমি চুপ করে রইলাম।

মহম্মদ বলে চলল, লেকিন ই সব ঝুটা বাত বাবুজী। উইলশন আসলি পেয়ার করে চামেলীর সাথে।

—চামেলী!

—হাঁ বাবুজী। চামেলী হিন্দু ব্রাহ্মণ আছে। ওর বাড়ী আছে কলকত্তা ভবানীপুর। উইলশনের সংগে ওর পেয়ার আছে।

আমার খুব অবাক লাগছে। উইলশনের পরিবার থেকে বেড়িয়ে আসার পর ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা এখনও স্পষ্ট হয় নি। কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। উইলশনকে দেখে আমার মনে হয়েছে ওর মধ্যে একটা চাপা দুঃখ আছে। তাহলে কি মহম্মদের কথাই ঠিক? উইলশন সত্যিই কি চামেলী ব'লে হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে ভালবাসে? কিন্তু কই, উইলশন সে কথা তো আমাকে বলল না। মিসেস্ উইলশনকে মনে পড়ল। শীর্ণ চেহারা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। মাথার সবকটি চুল পাকা। দেখে মনে হয় রবার্ট উইলশনের চেয়ে বয়সে বোধহয় কিছু বড়ই হবে। কিন্তু ভারী মিশুকে। আমাকে কত তাড়াতাড়ি নিজের মত করে নিল। মনে হল মিষ্টার উইলশনকে স্বামী হিসাবে পাওয়ায় মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করে। সে কথা মুখ ফুটে বলতেও তার বাধে না। অথচ উইলশন ·· ··

সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ফেলে দিয়ে মহম্মদ একটু নড়ে চড়ে বসে আবার গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, উইলশনের মনের মধ্যে একটা শখ ছিল বাবুজী। ওর দিল চেয়েছিল একটা বাঙালী লেড়কীকে সাদী করবার জন্য। লেকিন ওর পিতাজী ওর সাদীর ব্যবস্থা পাক্কা করে রেখেছিল।

এবার আমি কথা বললাম, তাহলে কলকাতায় উইলশন কি চামেলীর কাছেই থাকে নাকি?

—নেহি বাবুজী। উইলশন একলা থাকে। লেকিন চামেলীর সংগে ওর দেখা হয়, বাতচিত হয়।

—চামেলীর স্বামী কিছু বলে না?

—চামেলীর সাদী হয় নাই বাবু। পেয়ারের নাম লিয়ে উইলশনের কাছে সে কসম খেয়েছিল। তার কসম সে রেখেছিল।

লেকিন এ শালা উইলশন বেইমান আছে।

মহম্মদ আবার সিগারেট ধরাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তুমি এতসব জানলে কি করে?

মহম্মদ বলল, উইলশন আউর হাম একসাথে সারাবিখানায় যাই বাবুজী। একরোজ সারাব পিতে পিতে উইলশন খুব রোনে লাগল। ম্যায় পুছলাম, উইলশন, তুম রোনে লাগা কিঁউ?

উইলশন বলল, মহম্মদ ভাই, তুমি তো হামেশাই বলো তোমার পিতাজীকে তুমি খুন করেছ। লেকিন আর একটা খুন তুমি করতে পারবে?

ম্যায় পুছা, আরে দোস্ত ঘাবড়াও মত। শুন, মহম্মদ আলি জিসকা দোস্ত, ও যো মাংতা ওহি মিল যাতা। বোলো কিসকো খতম করনে হোগা?

উইলশন বোলা, মুঝে।

ম্যায় পুছা, কিঁউ!

—কিঁউ কি ম্যায় বেইমান হুঁ। ম্যায় চামেলি কো দিল দিয়া, বচন ভি দিয়া লেকিন মুঝকো দেনে নেহি সেকা।

এতক্ষণে রবার্ট লুই উইলশন আমার কাছে স্পষ্ট হ'ল। এতক্ষণে বুঝলাম, উইলশন কেন একা থাকে।

গাড়ী হু হু করে এগিয়ে চলেছে। উঁচু নীচু পাহাড়ী পথ। মহম্মদ ঘন ঘন গিয়ার চেঞ্জ করে উঁচুতে উঠছে পরক্ষণেই ইঞ্জিন বন্ধ করে নিউটালে নীচে নামছে। তখন গাড়ী আর মহম্মদের বশে নেই। নিজের বশেই বলের মত গড়িয়ে যাচ্ছে।

আমার বাজনা শুনতে খুব ভাল লাগে। রবিশঙ্করের সেতার, হিমাংশু বিশ্বাসের বাঁশী কিম্বা হাওড়ার শিতলাতলার মোহিত দাসের বেহালা যতই শুনি ততই ভাল লাগে। ভারি মিষ্টি হাত। ব্যানার্জীর গাড়ী চালানোর হাতও তেমনি মিষ্টি। গন্‌গনে রোদের তাপে পিচ্‌গলা রাস্তায়, একহাঁটু জলের তলায় ডুবে থাকা রাস্তায় কিংবা উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে সর্বত্রই ব্যানার্জীর গাড়ীতে চেপে সুখ পেয়েছি। অথচ মহম্মদ আলির গাড়ীতে চেপে মনে হচ্ছে পেছন থেকে একটা ঝড় এসে দূরন্ত বেগে এলোমেলো পথে আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

নিজের কথা বলতে গিয়ে কোন্ ফাঁকে মহম্মদ আলি উইলশনের কথার মধ্যে চলে গিয়েছিল। এখন আবার সে ফিরে এল।

বামহাত দিয়ে নিজের ডান দিকের গালের ক্ষতস্থানে হাত বুলোতে বুলোতে মহম্মদ বোধহয় কিছু ভাবছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ডান দিকের গালে ঐ কাটা দাগটা কি করে হ'ল মহম্মদ ?

মহম্মদ আলি হাত সরিয়ে আবার ষ্টিয়ারিং-এ রেখে বলল, ম্যায় আপকো বোলা না বাবুজী, পেয়ার বহুত বুরা চিজ হ্যায়। ইয়ে ক্ষত্ পেয়ার কা নিশানা হ্যায়।

পেয়ার কা নিশানা অর্থাৎ প্রেমের চিহ্ন। মহম্মদ আলির গালে গভীর ঐ ক্ষত চিহ্নের পেছনেও তাহলে পেয়ার।

জিজ্ঞেস করলাম, কার পেয়ার ?

মহম্মদ আলি বলল, আমার পিতাজীর।

এবার যেন মহম্মদকে একটু গম্ভীর হতে দেখলাম। বাম দিকের বাঁকে গাড়ী ঘুরিয়ে সে বলল, আমার পিতাজী আমাকে খুব পেয়ার করত। হামি ভি করতাম। লেকিন মেরা মাসী হামারা দুশমন থা। বচপন মে যখন হামার সাদী হোয়ে গেল মাসী তখন আমার বউটাকে একদম পেয়ার করল না। আমার

বউ বহুত রোনে লাগল, হাতে পায়ে ধরল। লেকিন মেরা মাসী কোন বাত শুনল না। আমার বউকে শ্বশুরাল রেখে এল। আমি পিতাজীর সাথে দর্জির কাজ করতাম। বাড়ী এসে শুনলাম কি বউ নেই। দিল বহুত ছোটা হয়ে গেল। রাতে নিদ এলো না। সবেরে উঠে পিতাজীকে পুছলাম, কেয়া হ্যায় মেরা কসুর? পিতাজী মাসীর সাথে বহুত ঝগড়া করল। লেকিন মাসী বলল, বউ এলে মাসী ঘরে থাকবে না। বহুত ঝঞ্ঝাট কা বাত। পিতাজীর খুন মাথায় চড়ে গেল। আমি বুঝলাম কি মাসীর সাথে আমার থাকা চলবে না। পিতাজীকে বললাম, বউ লিয়ে সেপারেট হয়ে যাবো। পিতাজীর দিল বহুত ছোটা হয়ে গেলো। লেকিন হামার উপায় ছিল না। বউটা হামাকে খুব পেয়ার করত।

মহম্মদ চুপ করল। দাঁতে দাঁত চেপে উল্টোদিকের একখানা লরিকে পাশ দিতে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা বড় রকমের গচ্চায় প'ড়ে গাড়ী লাফিয়ে উঠল। আমরাও লাফালাম। ভীষণ বাজে লাগছে। গাড়ী চালাতে বসে মহম্মদ বড় ছটপট করে। কথা বলতে বলতে প্রায়ই সে রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। আমার ভয় লাগে। মনে মনে ভাবি কাজ নেই খুনের গল্প শুনে। গল্প বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে কখন না আবার বিপদ ঘটিয়ে বসে। মোটরিষ্ট গাইডে দেখেছি লেখা আছে, গাড়ী চালানোর সময় যে কোন রকম উত্তেজনা থেকে মন মুক্ত রাখা উচিত। নইলে যে কোন মুহূর্তে এক্সিডেণ্ট।

কিন্তু মহম্মদের কোন কিছু গ্রাহ্য নেই। গচ্চা পার হয়ে রাস্তায় উঠতেই পরপর আরও দুটো লরি তার গা ঘেঁসে উল্টোদিকে চলে গেল। মহম্মদ গাড়ীর গতি আবার বাড়িয়ে দিল।

মহম্মদ আলির পিতাজী ছিল বেনারসের নামকরা ওস্তাগর। তার হাতের কাজও যেমন ভাল ছিল উপায়ও তেমনি ভাল ছিল। স্ত্রী মারা যাবার পর আপন শ্যালিকাকে সে বিয়ে করে। শ্যালিকাও পূর্ব-বিবাহিতা। কি কারণে যেন স্বামী তাকে ত্যাগ করেছিল। দুটি ছেলে নিয়ে নতুন সংসারে এসে সে বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু বাধ সাধল মহম্মদ বিয়ে করে।

মহম্মদের ওস্তাগর পিতাজী তাকে একটু অতিরিক্ত পেয়ার করত। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে আপন সন্তানের ওপর স্নেহ তার আরও বেড়ে গেল। ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসারে তার বেশ সুখেই কাটছিল।

ছেলের বউকে সৎমা কিন্তু ভাল চোখে দেখল না। পাছে সংসারে তার নিজের আধিপত্য কমে যায় সেই জন্য কারণে-অকারণে বউয়ের ওপর সে কর্তৃত্ব ফলাতে লাগল।

এদিকে মহম্মদের স্ত্রীর ছিল অল্পবয়স। শাশুড়ীর অকারণ গালিগালাজ আর তিরস্কার তার কিশোরী মনে দারুণ আঘাত দেয়। স্বামীকে সে অভিমানে কিছু বলেনা আর শ্বশুরকে এ সব কথা শোনাতে তার লজ্জা হয়। অগত্যা মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতে হয়।

মহম্মদ আলি কিছুই জানে না। সে দেখে তার কচি কলাগাছের মত সতেজ বউয়ের মুখে হাসি নেই, কাজে মন নেই। দিনরাত কি যেন ভাবে। সে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বউ-এর অভিমান আরও বেড়ে যায়। নিঃশব্দে সে চোখের জল ফেলে।

এদিকে গিন্নীর দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি পায়। বউয়ের নামে এটা সেটা লাগিয়ে কর্তার কান ভারী করে সে মহম্মদকে সংসার ত্যাগের নির্দেশ দেয়।

সন্ত বিবাহিত মহম্মদ ভেবে পায় না কি তার অপরাধ।

সবচেয়ে মুশকিলে পড়ে মহম্মদ আলির পিতাজী। সে না পারে ছেলে-বউকে ত্যাগ করতে আর না পারে স্ত্রীকে বশে আনতে। দু-নৌকায় পা দিয়ে মাথা তার টলমল করে।

ততদিনে মহম্মদ আলি বউকে নিয়ে নতুন সংসারে চলে যায়। শোকে দুঃখে নিরুপায় তার পিতাজী কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়।

এই রকমই চলছিল। মাঝখান থেকে ওস্তাগরের দুই সত্তাল্ল ছেলে টাকা-পয়সা আর জমি-জায়গা নিয়ে মহম্মদের সংগে ঝগড়া বাধিয়ে দিল।

এতদিনের শান্ত স্বভাবের মানুষ মহম্মদ আলি এবার কিন্তু ক্ষেপে গেল। অনেক দিন অনেক অন্যায় সে সহ্য করেছে। কিন্তু পাছে সংসারে অশান্তি হয়, পাছে পিতাজী মনে কষ্ট পায় তাই মুখ বুজে সব সহ্য করেছে।

কিন্তু আর নয়। এবার সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সুরু করল। ফলে সত্তাল্ল ভায়েরা একদিন তাকে ওস্তাগরের ব্যবসা থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিল।

দুঃখে আর অপমানে মহম্মদ আলি নির্মম হয়ে উঠল।

এই সময় একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে বউকে নিয়ে সে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল।

ফিরে এল তিন বছর পর। তখন তার অন্য চেহারা। তখন সে অন্য মানুষ।

ততদিনে ওস্তাগর ছেলের শোকে মৃতপ্রায়। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী আপন শ্যালিকার অনাদর আর উপেক্ষা তিল তিল করে তাকে অকালমৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

মহম্মদ গোপনে পিতাজীর সংগে দেখা করতে চায়। পিতাজীকে নিয়ে সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। কিন্তু মাসী আর সত্তাল্ল ভায়েরা তাকে বাড়ীতে ঢোকার কোন সুযোগ দেয় না।

মহম্মদ আলির রক্ত মাথায় চড়ে গেল। সে বুঝল যত কিছুর মূল তার মাসী। তাই একদিন রাতে হঠাৎ সে অস্ত্র হাতে মাসীকে আক্রমণ করল।

সেদিন পূর্ণিমা রাত। চারিদিকে ফুটফুটে আলো। মহম্মদ অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে মাসীকে আঘাত করতে যেতেই পিছন থেকে ওস্তাগরের রুগ্ন কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেল। ছেলের নাম ধরে ওস্তাগর ডাকছে।

প্রতিজ্ঞা ভুলে যায় মহম্মদ। ছুটে গিয়ে পিতাজীকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। মাসীর ঘুম ভেঙে যায়। হাঁক-ডাক করে তার দু-ছেলে মহম্মদকে আক্রমণ করে। তারই অস্ত্র দিয়ে তাকেই আঘাত করে তারা।

রুগ্ন ওস্তাগর ভয়ে চিৎকার করে হার্টফেল করে।

মহম্মদ তার ডান দিকের গালে হাত দিয়ে দেখে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হিংস্র জন্তুর মত সে দু-ভাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে চেঁচামেচিতে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। তারা মহম্মদকে ধ'রে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

একটা জোরে ব্রেক ক'রে গাড়ী থামাল মহম্মদ। তারপর ষ্টিয়ারিং-এ মাথা রাখল।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। বুঝলাম, দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মহম্মদ।

কয়েক মিনিট পর সে মাথা তুলল। দেখলাম, তার চোখে জল।

আস্তে ডাকলাম, মহম্মদ!

মহম্মদ ঘাড় ফিরিয়ে বলল, বাবুজী, সেদিন রাতে পিতাজীর ঘরে না ঢুকলে পিতাজী মরত না।

আমি সান্ত্বনা দিলাম, তুমি ভুল করছ। পিতাজী তোমাকে খুব পেয়ার করত। তাই তোমার মনে হচ্ছে পিতাজীর মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। কিন্তু এ তো তোমার দোষ নয়। এ তোমার ভাগ্য।

মহম্মদ বলল, লেকিন কিঁউ বাবুজী। মেরা নসীব কিঁউ এইসা হুয়া ?

আমি চুপ করে রইলাম। এর উত্তর আমার জানা নেই। মানুষের ভাগ্য তো তার নিজের হাতে নয়। বরং সে নিজেই তার ভাগ্যের হাতে।

গাড়ীতে আবার ষ্টার্ট দিতে আমি বললাম, তোমার পিতাজীই তোমাকে রক্ষা করেছেন। নইলে মাসীকে হয়ত তুমি সত্যই খুন ক'রে বসতে।

মহম্মদ সিগারেট ধরিয়ে বলল, জরুর বাবুজী। ম্যায় জরুর উন্‌কা জান লে লেতা।

—তবে। দেখতেই পাচ্ছো তোমার ভাগ্য তোমায় বাঁচিয়েছে।

মহম্মদ বলল, নেহি বাবুজী। মেরা নসীব বহুত খারাপ হ্যায়। পিতাজী মরনেকা বাদ ম্যায় বোম্বাই চলা আয়া।

—তোমার বউ ?

—উসকো ভি সাথ লে লিয়া। লেকিন কুছ দিন কা অন্দর ও ভি খতম্ হো গিয়া।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সেকি ! কি করে ?

মহম্মদ আগের মতই বলল, কেয়া জানে উসকো কেয়া হোগিয়া। একদিন রাতে ও নিদ গেল লেকিন সবেরে আর উঠল না।

মহম্মদ আবার চুপ করল।

আমি ঘড়ি দেখলাম। প্রায় চারটে বাজে। আমরা নাসিকের কাছাকাছি এসে গেছি।

নাসিক—মহারাষ্ট্রের এক উল্লেখযোগ্য শহর। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা নাসিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব। মনে পড়ল, এই নাসিকের পূর্ব নাম পঞ্চবটী। গোদাবরী নদীর তীরে এই পঞ্চবটী কোটী কোটী বছর আগে সেই ত্রেতা যুগ থেকে কত না কাহিনীর সাক্ষ্য বুকে নিয়ে আজও অবস্থান করছে। মনে পড়ল, রামায়ণের কথা। পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসে কাটাতে গিয়ে সস্ত্রীক রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে শেষ কয়েক বছর রাক্ষসদের এড়িয়ে নিরুপদ্রবে বাস করার জন্য অগস্ত্য মুনির পরামর্শ মত এই নাসিকে এসে পাতার কুটীর তৈরী করেছিলেন। কিন্তু তখন অগস্ত্য মুনি বা রামচন্দ্র কেউ-ই ভাবতে পারেন নি যে রামচন্দ্রের জীবনের সবচেয়ে বড় উপদ্রবের সাক্ষী হয়ে এই পঞ্চবটী চিরকাল জেগে থাকবে।

আজ সে রামও নেই আর সে পঞ্চবটীও নেই। পঞ্চবটী আজ নতুন নাম নিয়ে নতুন ভাবে জেগে উঠেছে। এখন এই নাসিক-এ গড়ে উঠেছে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, কারেন্সী নোট প্রেস। তৈরী হয়েছে পুলিশ ট্রেনিং কলেজ। কিন্তু তবুও ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর কাছে পঞ্চবটীর সুন্দর নারায়ণের মন্দির, সীতাগুহা, কপালেশ্বর মন্দির, রামকুণ্ড, নাড়ু শংকরের মন্দির আজও পরম পবিত্র স্থান বলে পূজিত হয়ে আসছে।

মহম্মদ আলির গাড়ী পঞ্চবটীর চৌহদ্দির মধ্যে এসে গেছে। সামনেই পাহাড়ের গা বেয়ে সুন্দর একটি ঝরণা রাস্তা পার হয়ে খাদে এসে গড়িয়ে পড়ছে।

আমার সামনের গাড়ীগুলোকে দেখলাম খুব ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়া ঝরণার জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল।

আমি গাড়ী থামাতে বললাম।

মহম্মদ গাড়ী থামিয়ে সাইড করে রাখতে আমি নেমে ঝরণার জলের কাছে এগিয়ে গেলাম।

খুব একটা উঁচু থেকে না পড়লেও ঝরণার জল অসংখ্য বুদবুদের রাশি রাশি ফেনার মধ্য দিয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ছে।

আমি একমুঠো ফেনা হাতে তুলে নিলাম।

একটা শীতল স্পর্শে শরীর জুড়িয়ে গেল। মহম্মদ আলির দিকে তাকালাম। আমার ছেলেমানুষি তাকে এতটুকু প্রভাবিত করে নি। গাড়ীতে নিজের জায়গায় বসে সে একমনে সিগারেট খেয়ে চলেছে।

এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব শান্ত, নিতান্ত গো-বেচারী একজন ড্রাইভার। আর পাঁচজন সাধারণ ড্রাইভারের মত সংসার ছেড়ে, প্রিয়জন ছেড়ে সে দেশে দেশে গাড়ী চালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর তার মন বাড়ীর দিকে পড়ে আছে।

কিন্তু হায়! মহম্মদ আলির সংসার নেই, প্রিয়জন নেই। তার কেউ নেই! সে একা।

আজ মহম্মদ আলি অন্য মানুষ। আজ সে একা কিন্তু একাই একশো। বোম্বাই-এর এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষেরা তাকে আজ মাথায় করে রেখেছে। তাদের কাছে মহম্মদ আলির পরিচয় আলি সাহেব। এই আলি সাহেব তাদের সহায়-সম্বল, তাদের বর্তমান, তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের বিচারক, তাদের বন্ধু, প্রিয়-পাত্র, একান্ত আপনজন, তাদের দেবতা। এই সব মানুষেরা শহরের বস্তি এলাকায় বাস করে। কেউ বলে এরা সমাজ বিরোধী, এরা ছদ্মবেশী শয়তান। কিন্তু আলি সাহেব বলে, না। এরা সমাজের অবহেলিত, পদদলিত মানুষেরই দল। এরা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে পড়ে আছে। এদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সমাজের উঁচুতলার মানুষ নিজেদের কার্যসিদ্ধির হাতিয়ার করে রেখেছে এদের।

এই সব মানুষের অনেক অন্যায়, অনেক পাপ। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়! যাদের জন্যে তাদের এই অন্যায়, এই পাপ—তারাই কিন্তু এদের বিচারকর্তা। তারা শাস্তি দেয়—জরিমানা, জেল অথবা মৃত্যু।

এরা কেঁদে লুটিয়ে পড়ে আলি সাহেবের পায়ে। আল্লা। মুঝে জিনে দেও।

এদের কান্না দেখে মহম্মদ আলির পিতাজীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, মৃত্যুর আগে এমনি ভাবে চোখের জল ফেলে পিতাজীও বুঝি নিঃশব্দে বলতে চেয়েছিল, বেটা! মুঝে জিনে দেও। মনে পড়ে বউ-এর কথা। হায়! কত অন্যায় কত অত্যাচার সহ্য করেছে সে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে নি। শুধু দিনরাত কেঁদে কেঁদে বউটা মারা গেল।

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে আলি সাহেবের। ডান দিকের গালের ক্ষতস্থানে হাত দিতেই প্রচণ্ড এক প্রতিশোধের স্পৃহা তাকে উন্মত্ত করে তোলে। তার সমস্ত কিছু শুভ বুদ্ধি হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় সে নিজে। সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অত্যাচারের স্তূপ ভেদ করে জন্ম নেয় এক নতুন মানুষ। নাম তার আলি সাহেব।

আলি সাহেব! এ শুধু একটা নাম নয়। একটা স্থির বিশ্বাস, একটা ন্যায্য বিচার, একটা নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু তবু সব মিলিয়ে আলি সাহেব একটা বিভীষিকা।

পাহাড়ী রাস্তা। ঘন ঘন বাঁক। বাঁকে বাঁকে ট্রাফিক সাইন্, সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি।

মহম্মদ আলির ঠোঁটে সিগারেট, হাতে ষ্টিয়ারিং। নিঃশব্দে গাড়ী চালাচ্ছে সে। দুপাশে পঞ্চবটীর গাছে গাছে পাখীদের কল-কূজন—পাহাড়ের গায়ে গায়ে নাম না জানা রঙীন ফুলের বাহার।

আমি মহম্মদের দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবছি, এখন সে মহম্মদ আলি না শুধু আলি সাহেব।

একটা ব্যাপার এখনো কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। যে আলিসাহেবের এত নাম ডাক। যে কতশত মানুষের আশ্রয়—তার কেন এই রাস্তায় রাস্তায় গাড়ী নিয়ে নিরাশ্রয়ের মত ঘুরে বেড়ানো।

মহম্মদ আলি একই ভাবে গাড়ী চালাচ্ছে। আমি খুব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু মনে কোরো না আলি সাহেব! একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তুমি এই ড্রাইভারী লাইনে কি করে এলে?

আলি সাহেব কোন উত্তর দিল না। যেমন চুপচাপ ছিল তেমনিই রইল।

আমিও আর কিছু বললাম না। ভাবলাম, বোধহয় অন্য কিছু ভাবছে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর আলি নিজেই বলল, বেনারস থেকে যেবার প্রথম আমি বোম্বাই আসি তখন কমল রায় বলে একজন মোটর মেকানিকের সংগে আমার দোস্তি হয়েছিল। কমলবাবুর কাছেই আমি ড্রাইভিং শিখে বোম্বাই-এ তিন বরস গাড়ী চালিয়েছিলাম। ঐ কমলবাবুর একটা লেড়কী আছে। সে আমাকে ভাইয়া বলে। আমার কোন বহিন নাই। আমি তাকে বহিনের মত পেয়ার করি। লেকিন আজ সে পাঁচ বরস পহলে কমলবাবু একটা গাড়ী ডেলিভারী দিতে নাগাল্যাণ্ড যাচ্ছিল। রাস্তায় ডাকুরা তার গাড়ী লুঠ করে তাকে খাদের মধ্যে ফেলে দেয়।

আলি সাহেব চুপ করল।

আমি বোকার মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম, মারামারি, কাটাকাটি, খুন-জখম, অন্যায় আর অত্যাচারের সংগে মহম্মদের জীবন আষ্টেপিষ্টে বাঁধা। রামায়ণের রামচন্দ্রের মতই নিরাপদ আশ্রয়ে নিরুপদ্রবে বাঁচার জন্য মহম্মদ যেখানেই গেছে

বিপদ আর উপদ্রব সর্বত্রই তার পিছু নিয়েছে। পেয়ারের কাঙাল মহম্মদ যাকেই আপনজন বলে আঁকড়ে ধরতে গেছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই তাকে ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে গেছে।

মহম্মদের চোখে আবার জল দেখলাম। এক একটি প্রিয়জনের মৃত্যু তার সতেজ সবল বুকখানাকে শোকের তাপে মরুভূমি করে দিয়ে গেছে। তবু আজও আলি সাহেব বেঁচে আছে। বেঁচে আছে একটি মরুদ্যানের দিকে তাকিয়ে। সে মরুদ্যান কমল বাবুর মেয়ে। মহম্মদের বহিন—সোনালী।

সোনালী। সোনালী রায়। মেকানিক কমল রায়ের মেয়ে সোনালীর রূপ কাঁচা সোনার মতই সুন্দর, ঝকঝকে, তকতকে। সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়েছে সে। গাড়ীতে বসেই মহম্মদ তার কালো রেশমের মতো হাল্কা চুলের মিষ্টি তেলের গন্ধ পায়। বাপ-মা মরা মেয়ে। সবাই তাকে অনাথাই বলবে। কিন্তু মহম্মদ তাকে অনাথা ভাবতে দেয় না। সোনালীকে সে আপন বহিনের মতই পেয়ার করে। তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। একটা ভাল লেড়কার সাথে তার সাদী দিতে চায়।

আলি সাহেবের বহিন সোনালীকে আলি সাহেবই শুধু পেয়ার করে না। তার সরল মনের ছোঁয়ায় সকলেই আনন্দ পায়। আলিসাহেব বহিনের বিয়ে দেবে শুনে ছোট বড় অনেকেই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু না। আলি সাহেব একটি পয়সাও নিতে পারে না। বহিনের কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—নিজের হাতে সম্পূর্ণ সৎপথে টাকা উপায় ক'রে তাকে বহিনের সাদী দিতে হবে।

আলি সাহেব একা। তার কোন কিছুরই অভাব নেই। গোটা বোম্বাই জুড়ে তার অসংখ্য বস্তি এলাকার মানুষ। আলিসাহেব তাদের রাজা। তাদের আশা-ভরসা। তাদের কলহ-বিবাদের বিচারক। বিপদে-আপদে তাদের ত্রাণকর্তা।

শহরের উঁচু তলার মানুষেরাও তাকে চেনে। তারা জানে যে আলিসাহেব পাথরের মত কঠিন। আবার ফুলের মত নরম। তার বস্তিবাসী মানুষের জন্য আলিসাহেব কখনও কখনও উঁচুতলার মানুষের সংগে বসে আলাপ-আলোচনা করে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে। বস্তির জীবনে উন্নতি আনতে হবে। শহর থেকে নিষিদ্ধ এলাকা তুলে দিতে হবে। এইসব অসংখ্য অন্ধকারের মানুষ যাতে সৎভাবে জীবন কাটাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

পিতাজীর মৃত্যুর পর বোম্বাই-এ এসে মহম্মদ যখন তার বউকেও হারাল তখন এক জঘন্য উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়ল। শৈশব থেকেই তার ছিল ইস্পাতের মত শক্ত শরীর। পিতাজীর মৃত্যুর পর তার মনে এসে ঢুকল দুর্জয় সাহস। দুয়ে মিলে অল্পদিনের মধ্যে মহম্মদ আলি হয়ে উঠল এক অদ্বিতীয় ব্যক্তি। সমাজবিরোধী লোকেরা সব সময়েই এমন একজনকে খোঁজে যাকে সামনে রেখে তারা অনায়াসে অসৎ কাজে লিপ্ত হতে পারে। সেইসব লোকেরা মহম্মদ আলির দুর্জয় সাহস দেখে তাকে নিজেদের গুরুর আসনে বসাল। আলিসাহেব রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠল।

কমল রায় ছিল বোম্বাই-এর ,এক অটোমোবাইল রিপেয়ারিং কারখানার হেডমিস্ত্রী। মহম্মদ আলিকে সে অনেকদিন থেকে দেখছে। কয়েক বছর আগে প্রথমে এক দরজির দোকানে তাকে সে সেলাইয়ের কাজ করতে দেখেছিল। ঐ দোকানের মালিকের মোটর গাড়ী মেরামতের ভার ছিল কমল রায়ের ওপর।

মহম্মদ আলি মাঝে মাঝে মালিকের মোটরে চেপে বাজার থেকে কাপড় আর সেলাই-এর সরঞ্জাম কিনতে বেরুত। তখন রাস্তায় গাড়ী খারাপ হ'লে কমল রায়কে খবর দেওয়া বা তাকে ডেকে আনার ভার পড়ত তার নিজের ওপর।

এমনি ভাবে মহম্মদের সংগে কমল রায়ের পরিচয় হয়। পরে কমল বাবুরই চেষ্টায় সেলাই-এর কাজের ফাঁকে ফাঁকে মহম্মদ মোটর

ড্রাইভিং শিখতে সুরু করল।

আজ সেই কমল রায় দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হয়েছে। কিন্তু মহম্মদ আলির বুকের মধ্যে সে আজও বেঁচে আছে। মহম্মদ আলি অকৃতজ্ঞ নয়। সে বেইমান নয়। কমল রায়ের মেয়ে সোনালী তার বহিন। সেই বহিনের সাদী দেবার জন্যেই তার এই কনভয়ে ড্রাইভারী। এই ড্রাইভারীর প্রতিটি পয়সা সে সৎপথে উপায় করে। নইলে তার বহিন একটি পয়সাও নেবে না। নইলে সোনালীর সাদী হবে না।

গাড়ী নাসিক-এ হল্ট করল।

গাড়ী লাইনিং ক'রে মহম্মদ ষ্টার্ট বন্ধ করল। তারপর বাইরে এসে আমার দরজা খুলে সেই আগের মত মাথা নিচু করে খুব ষ্টাইলের সংগে বলল, আইয়ে বাবুজী।

আমি মাথা নিচু ক'রে সীটে বসেছিলাম। মহম্মদ আলির দিকে তাকাতে কেমন অস্বস্তি লাগছিল। ভাবছিলাম, কি জানি চোখ তুললেই যদি আবার তার চোখে জল দেখি তাহলে কি নিজের চোখ দুটোকে সামলাতে পারবো!

মহম্মদ আর কিছু না বলে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি খুব করুণ চোখে ওর দিকে অতি কষ্টে তাকালাম। দেখলাম মহম্মদের চোখ শুকনো খটখটে। মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। ধীরে ধীরে ঝোলা কাঁধে মাটিতে পা দিলাম।

দরজা বন্ধ করে মহম্মদ আলি বলল, বাবুজী, কিছু কসুর হয়ে থাকলে আমাকে মাপ করবেন। আর যদি পারেন কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার সোনালী বহিনের সাদী দিবার জন্য একটা ভাল লেড়কার সন্ধান দিবেন।

আমি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে মহম্মদের কথায় সায় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, একটা কথা মহম্মদ। সেদিন রাতে কনভয়ের নিয়ম ভঙ্গ ক'রে গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার তোলার জন্যে মিশ্রজী তোমার বিচারের ভার দিয়েছিল আমার ওপর। সেদিন কিছু না বুঝেই তোমার কসুর আমি মাপ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ বড় জানতে ইচ্ছে করছে—তোমার বোনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নিশ্চয়ই সওয়ারিদের কাছ থেকে অসৎ ভাবে তুমি বাড়তি কিছু উপায় করোনি। তবে কেন তুমি নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের গাড়ীতে তুলেছিলে মহম্মদ? যার জন্যে অতগুলো লোকের সামনে তোমাকে ছোট হ'তে হ'ল।

আমার কণ্ঠে সন্দেহের স্পষ্ট সুর শুনে মহম্মদ অপরাধীর মত চোখ নামিয়ে বলল, হাঁ বাবুজী। ইয়ে সাচ বাত হ্যায় কি ম্যায় কানুন তোড়া। লেকিন কানুন না ভেঙ্গে আমার উপায় ছিল না বাবুজী। সওয়ারির মধ্যে একটা লেড়কী ভি ছিল। আউর ও লেড়কী ঠিক আমার সোনালী বহিনের মত ছিল। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়ে ওরা আমায় হাত দেখাল। আমি একবার ভাবলুম কি সব গাড়ী তো পেরিয়ে গেলো আমি ভি চলে যাই। লেকিন পারলাম না বাবুজী। লেড়কীর চোখে-মুখে হেড লাইটের আলো পড়তে আমার বহিনের মুখটা মনে পড়ে গেল। আমি জোরে ব্রেক কষে গাড়ী রুখে দিলাম। আউর সওয়ারিদের তুলে নিলাম।

আমি ভীষণ ভাবে ঠকে গেলাম। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। এবার আর কোন উত্তরই মুখে যোগাল না। নিঃশব্দে ছোট ছোট পা ফেলে ব্যানার্জীর গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম।

রাত তখন এগারটা। গাড়ীর ভেতর বসে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। নির্মেঘ আকাশে নক্ষত্রের মেলা বসেছে। আজ পঞ্চবটীর এই আকাশের নিচে বসে কনভয়ের যাত্রাপথের শেষ রাতের বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছি আর ভাবছি—অদ্য শেষ রজনী। কাল প্রভাতের সংগে সংগে শেষ হবে বিশ্রাম। অবশিষ্ট পথটুকুর চলা হবে সুরু। আর কতটুকুই বা পথ। মাত্র একশো সাতাত্তর কিলোমিটার। তার পরেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল—বোম্বাই। পাহাড়ে ঘেরা ছোট এক দ্বীপের ওপর সুন্দর এক পোতাশ্রয়—বোম্বাই। সমুদ্রপথে ভারতের প্রথম প্রবেশদ্বার—বোম্বাই। মহা-রাষ্ট্রের রাজধানী—বোম্বাই।

শিউশংকর মিশ্রের গাড়ীতে এখনও আলো জ্বলছে। মিশ্রজী আজ গাড়ীতে বসেই কনভয় ট্র্যিরের যাবতীয় খরচার চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ করছে। আজ রাতটুকু কাটলেই মিশ্রজীর দায়িত্বের পনের আনা শেষ হবে। বাকি থাকবে এক আনা। শেষ হবে বোম্বাই পৌঁছে। তার চারদিকে গাড়ীর সীটের ওপর ছড়ানো রয়েছে অনেক কাগজপত্র। ইনভয়েস, ইনসিওরেন্স, রোড পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, এক্সারসাইজ গেটপাশ, ড্রাইভার লিষ্ট, ফাষ্ট পেমেণ্ট, সেকেণ্ড পেমেণ্ট-এর হিসাব, আরও অনেক কিছু। এর প্রতিটি কাগজই দরকারী। কোনটাই ফেলনা নয়। মিশ্রজী সিগারেট খাচ্ছেন আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেব দেখছেন।

রায়পুরে মিশ্রজী আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু সেদিন রাতে পুরানো দোস্ত-এর সংগে পেট্রোল পাম্পে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার সংগে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে নেশা করতে হয়েছিল।

রামকিশন বাজোরিয়ার একমাত্র সঙ্গী শিউশংকর মিশ্র যে

একেবারেই নেশা করে না তা নয়। তবে তা কখনোই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। বাজোরিয়া মাঝে মাঝে মিশ্রজীকে সঙ্গে নিয়ে বার-এ গিয়ে তার সামনে মদের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে। মিশ্রজীও হাসিমুখে তা তুলে নিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বাজোরিয়া গ্লাসের পর গ্লাস গলায় ঢেলেছে আর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর কনভয় ইনচার্জ শিউশংকর মিশ্র তার অভ্যাস মত গ্লাসের হিসেব করে গেছে। যখন দেখেছে বাজোরিয়া মাত্রা ছাড়িয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে তখন তার হাত ধরে গাড়ীতে তুলে দিয়েছে।

গাড়ীর ড্রাইভার ভ্রমর সিং-এর এ এক নিত্য কাজ। চৌরঙ্গীর আর. কে. ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর ছুটি হয় সন্ধ্যে ছ'টায়। বাজো-রিয়ার হাতের কাজ শেষ করতে সময় লাগে আরও এক ঘণ্টা। ঠিক সাতটায় ভ্রমর সিং তার গাড়ী নিয়ে দরজায় লাগিয়ে দেয়। আদ্দির গিলেকরা পাঞ্জাবী আর ব্রেশলেট ধুতিপরা রামকিশন বাজোরিয়া গাড়ীতে উঠে বসতেই ভ্রমর সিং গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়। গাড়ী পার্ক-স্ট্রীটের নির্দ্দিষ্ট বার-এর সামনে এসে দাঁড়ায়। বাজোরিয়া গাড়ী থেকে নেমে বার-এ ঢোকে।

এদিকে ভ্রমর সিং গাড়ীতে বসে বসে প্রহর গোণে। এক...দুই ...তিন...চার। ঘড়িতে বারোটা বাজে। বাজোরিয়ার নির্দ্দেশে ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজলেই ভ্রমর সিং হোটেলের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। বাজোরিয়া সাহেব টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে।

ভ্রমর সিং আস্তে ডাকল, সাহাব!

রামকিশন মাথা তুলল। জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল চোখ নেশার ঝোঁকে বুজে বুজে আসছে। তবু ভ্রমর সিং-কে চিনতে ভুল হয় না তার।

ভ্রমর সিং! তার লম্বা ঝুলপি আর ধনুকের মত বাঁকা গোঁফ-জোড়া সমেত গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর করে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বাজোরিয়া সাহেব বুঝতে পারে ভ্রমর সিং-এর রাগ হয়েছে।

রাগ তো হবেই। রাগ হবারই তো কথা। আজ পঁচিশ বছর এই বাজোরিয়া সাহেবের গাড়ী চালাচ্ছে ভ্রমর সিং। এর মধ্যে কত কাণ্ড হয়ে গেল। কত ঘটনা, কত দুর্ঘটনা।

পঁচিশ বছর আগে বাসুদেব আগরওয়ালার কাছে চাকরী করত ভ্রমর সিং। বাজোরিয়া সাহেবের বিয়ের সময় আগরওয়ালা সাহেব জামাইকে যৌতুক হিসেবে প্রথম গাড়ী দেয়। সেই গাড়ীতে চেপেই বাজোরিয়া সাহেব বিয়ে করতে যায়।

মোটর গাড়ী তখন আর মোটর নয়—ময়ূরপঙ্খী নৌকা। ফুলে ফুলে সাজান নৌকার হাল ধরার জন্য আগরওয়ালা সাহেব গাড়ীর সঙ্গে ড্রাইভার ভ্রমর সিং-কেও বুঝি যৌতুক দিয়েছিল। সেদিন থেকেই ভ্রমর সিং রামকিশন বাজোরিয়ার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী।

সাহেবের বাবাকে ভ্রমর সিং দেখেছে। সাহেবের থেকেও সুন্দর। যেমন চেহারা তেমন ব্যবহার। সাধারণ ভাবে বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির। কিন্তু রাগলে একেবারে অন্য মানুষ। তখন বউ বল, ছেলে বল, মায়া বল, মমতা বল কিচ্ছু নেই। তখন শুধু রাগ।

আগরওয়ালা সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য সাহেবের ওপর তার সে কি রাগ! ছেলেকে ত্যাগ করে সেই যে রেঙ্গুনে ফিরে গেল আর দেখা নেই।

রামকিশন বাজোরিয়া প্রথম প্রথম ভুলে থাকতে চাইত। নতুন সংসার আর কনট্রাক্টারের ব্যবসা নিয়েই সময় কেটে যেত তার

তখন শুধু কাজ আর কাজ। ঘোরা আর ঘোরা।

ক্রমে বয়স বাড়ল। সংসার বড় হল। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে হল সাহেবের। কিন্তু না। এরা কেউ বাপ-ঠাকুর্দার রূপ পেল না।

বাসুদেব আগরওয়ালা চার নাতি-নাতনির জন্য গাড়ী ভর্তি করে উপহার পাঠাতে লাগল। ছেলে-মেয়েদের সে কি আনন্দ!

বাজোরিয়া সাহেবের মনে কিন্তু সুখ নেই। তার মনে অন্য আশা ছিল। ভেবেছিল, রেঙ্গুন থেকে একটি বারও অন্ততঃ বাবা-মা এসে নাতি-নাতনিকে দেখে যাবে। সেই উদ্দেশ্যে বার কয়েক পত্রও দিয়েছিল রামকিশন।

কিন্তু রামনন্দন বাজোরিয়া কোন সাড়াই দিল না।

এতোদিনে বোধহয় নিজের ভুল বুঝতে পারল রামকিশন। বাবা-মার বিনা অনুমতিতে বিয়ে করাটা তার ঠিক হয় নি।

ধীরে ধীরে মনমরা হয়ে যায় সাহেব।

অফিসের সামনে গাড়ী থামিয়ে ভ্রমর সিং দেখে সাহেব অন্যমনস্ক হ'য়ে কি যেন ভাবছে।

ভ্রমর সিং ডাক দেয়, সাহাব!

বাজোরিয়া সম্বিৎ ফিরে পায়। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে অফিসে ঢোকে।

ভ্রমর সিং বুঝতে পারে, কোথায় একটা গোলমাল হচ্ছে। কিন্তু এসব ভাববার তার অধিকার নেই। সে ড্রাইভার। যতক্ষণ গাড়ী থাকবে ততক্ষণই ড্রাইভার। গাড়ী নেই তো ড্রাইভারও নেই। বাজোরিয়া সাহেব গাড়ীতে বসে যাই করুক না কেন ভ্রমর সিং-এর সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত নয়। বাজোরিয়া সাহেব মালিক। আর ভ্রমর সিং ড্রাইভার।

কিন্তু তবু ভ্রমর সিং ভাবে। না ভেবে সে পারে না। সে জানে, বাজোরিয়া সাহেবের সঙ্গে তার শুধু প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়।

চব্বিশ ঘণ্টা যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয় তার সঙ্গে সম্পর্কের এ তফাৎ বেশী দিন রাখা যায় না। আজ ভ্রমর সিং দেখে, যত দিন যাচ্ছে বাজোরিয়া সাহেব ততই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তার কাজে মন নেই, ঘোরায় মন নেই, হাসি-ঠাট্টায় মন নেই।

সাহেব এমনি বিমনা হলেই ভ্রমর সিং-এর ভাবনা বেড়ে যায় এখুনি সাহেব গাড়ী নিয়ে পার্কস্ট্রীটে যেতে বলবে। আর পার্কস্ট্রীটে গেলেই সাহেব বার-এ ঢুকবে।

সাহেবের এই বার-এ আসার খবর এক ভ্রমর সিং ছাড়া আর কেউ তেমন জানত না। আগে এখানে এসে এক আধ ঘণ্টার বেশী থাকতও না সাহেব।

এখন সবাই জেনে গেছে। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, শ্বশুর সবাই জানে যে বাজোরিয়া সাহেব রাত বারোটা পর্য্যন্ত কোথায় থাকে। কিন্তু কেউ কোন আপত্তি করে না। আর এইটাই ভ্রমর সিং-এর সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে।

ভ্রমর সিং দেখে, সাহেব জলের মত অর্থব্যয় করছে। আজকাল ঘোড় দৌড়ের মাঠেও সাহেবকে নিয়ে যেতে হয়। গ্যালারীতে সাহেবকে বসিয়ে দিয়ে বাইরে এসে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করে ভ্রমর সিং।

সাহেব বাইরে এসে গাড়ীতে বসেই পার্কস্ট্রীটে যাবার নির্দেশ দেয়। ভ্রমর সিং নিঃশব্দে গাড়ী নিয়ে ছুটে চলে।

কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। ভ্রমর সিং এতসব সহ্য করতে পারে না। তার চোখের সামনে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বাজোরিয়া সাহেব একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে।

শ্বশুরের দেওয়া গাড়ী আজকাল আর চাপে না সাহেব। সে গাড়ী ছেলে-মেয়ে আর মেমসাহেব ব্যবহার করে। এর মধ্যে সাহেব দু-দুবার নিজের জন্য গাড়ী কিনেছে আবার কিছুদিন পর বিক্রি করে দিয়েছে। তখন না গাড়ী না ড্রাইভার। বাজোরিয়া সাহেবকে

তখন ট্যাক্সিতে যাতায়াত করতে হয়েছে।

খবর পেয়ে বাসুদেব আগরওয়ালা অপর একখানা গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সাহেব সে গাড়ী ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে।

তখন মুশকিলে পড়েছে ভ্রমব সিং। সাহেবের গাড়ী নেই। তাই ড্রাইভারেরও দরকার নেই।

কিন্তু গাড়ী না থাকলেও ভ্রমব সিং থাকে। বাজোরিয়া সাহেব যখন ট্যাক্সীতে যাতায়াত করেন, তখন ড্রাইভারের পাশের সিটে ভ্রমর সিং থাকে।

ভু-ভুবার এই গাড়ী বিক্রির ব্যাপারটাতেই কেমন সন্দেহ জাগে ভ্রমব সিং-এর। সে ভাবে, সাহেব গাড়ী বিক্রি করল কেন?

আসল খবর পেতে দেরী হয় না। শিউশংকর মিশ্র নিজের হাতে গাড়ী বিক্রি করে সেই টাকায় সাহেবের বাড়ীভাড়া মিটিয়েছে।

অবাক কাণ্ড! রামনন্দন বাজোরিয়ার ছেলে রামকিশন বাজো-রিয়াকে সামান্য বাড়ীভাড়া মেটানোর জন্য গাড়ী বিক্রি করতে হল?

সামান্য বইকি! গণেশ টকীর কাছে পাঁচতলা বাড়ীর ওপর তলার গোটাটা দেড় হাজাব টাকায় ভাড়া নেওয়া আছে বাজোরিয়ার। বাজোরিয়ার মত লোকের কাছে দেঁড় হাজার টাকা সামান্য বইকি।

কিন্তু কেন ভাড়া দিতে পারে নি সাহেব? তাহলে কি সাহেবের আয় কমে যাচ্ছে? নাকি ব্যয় বাড়ছে? সংসারে অনেক মানুষ বাজোরিয়ার। নিজের সংসার ছাড়া কোম্পানীর কয়েকজন বাদ দিলেও অনেক লোক। এদের সবাইকে সাহেব চেনেও না। অধিকাংশই মেমসাহেবের আত্মীয়-স্বজন।

বাজোরিয়া সাহেব টেবিল থেকে উঠতে গিয়েও উঠতে পারে না। জড়ানো গলায় ডাক দেয়,—ভ্রমর সিং!

ভ্রমর সিংএর চোখ জ্বালা করে। কেন সাহেব এমন করে মদ খায়! কি ভুলতে চায় সাহেব! তার অতীত না বর্তমান!

রায়পুরের পেট্রোল পাম্পে বন্ধুর সঙ্গে মদ নিয়ে বসলেও শিউশংকরবাবু সেদিন রাতেও মাত্রা ছাড়ায় নি। তবে সেদিন তার সামান্য নেশা হয়েছিল। আর নেশার ঝোঁকেই আমার নিমন্ত্রণের কথা মিশ্রজী ভুলে গিয়েছিল। পরের দিন অবশ্য এর জন্য ক্ষমা চাইতে ভুল হয় নি তার।

এত রাতে এখনও ব্যানার্জীর দেখা নেই। আজ বোরগাঁও থেকে নাসিক আসার পথে তার গাড়ীর যন্ত্রপাতি দু-একবার গণ্ডগোল করেছিল। যতিন মিস্ত্রীর সঙ্গে রাত নটা পর্য্যন্ত গাড়ী মেরামত করে সে খাওয়া-দাওয়া সারতে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেছে। হয়ত কারোর গাড়ীতে বসে তাস খেলছে।

কনভয়ের ড্রাইভারদের অনেকেরই এই তাসের নেশা আছে। চারজন, তিনজন এমন কি দুজন ড্রাইভার একসঙ্গে হলেই সময় কাটাতে তাস নিয়ে বসে। ব্যানার্জী তাস খেলতে ওস্তাদ। মেমের ছবি লাগানো এক বাণ্ডিল তাস দেখেছি তার কাছে। সুযোগ পেলেই সে কারো না কারো সংগে তাস নিয়ে বসেছে। অনেক রকমের খেলা জানে সে। টুয়েন্টি নাইন, ব্রে, ব্রীজ, বিন্তি, তেতাস।

আজ নিয়ে যে ক'দিন আমার চলা সুরু হয়েছে তার অধিকাংশ সময়ই কেটেছে ব্যানার্জীর গাড়ীতে। অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার! এই ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার খুব কম কথা হয়েছে। তবে যতটুকু কথা হয়েছে তার মধ্যে মনে হয়েছে ব্যানার্জী একটু চাপা স্বভাবের মানুষ। নিজের সম্বন্ধে সে চট করে কোন কথা প্রকাশ করতে চায় না।

রাত সাড়ে এগারোটা। মিশ্রজীর গাড়ীর আলো নিভে গেল। কিন্তু মিশ্রজীর চোখের আলো বাকি রাতটুকুও জ্বলবে। বড় বড়

গোল গোল চোখ তার। ভেতরটা কেমন ঘোলাটে। কিন্তু এই বয়সেও শিউশংকরবাবুর চশমা নেই। তার ঘোলাটে চোখের তীক্ষ্ণ নজর শুধু ওপর থেকে নয় যেন ড্রাইভারদের ভেতর পর্য্যন্ত দেখে নেয়। শিউশংকর মিশ্র তাই শুধু কনভয় ইন্‌চার্জ নয়, আর. কে. ট্রান্সপোর্ট' কোম্পানীর সঙ্গে কিংবা তার মালিক বাজোরিয়ার সঙ্গে শিউশংকরবাবুর যে সম্পর্কই থাক কনভয়ের ড্রাইভারদের সংগে তার নাড়ীর যোগ রয়েছে। মিশ্রজী নিজেও একজন ড্রাইভার। তার ড্রাইভারী জীবনের ইতিহাসে অনেক দুঃখ, অনেক পরিশ্রম, অনেক অভিজ্ঞতা।

মজঃফরপুরের অখ্যাত মিশ্র পরিবারে শিউশংকরের যে বছর জন্ম হ'ল সেই বছরই সম্রাট পঞ্চম জর্জ তার রাণী মেরী-কে নিয়ে ভারতবর্ষ ভ্রমণে এলেন।

সেটা ১৯১১ সাল। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন ভারতবর্ষের গবর্নর-জেনারেল। দিল্লীর দরবারে সেবার ঘোষিত হ'ল, কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবে। শিউশংকরের কাকা রামপ্রসাদ মিশ্র তখন হাওড়ায় ঘোড়ার গাড়ী চালাতো। রাজধানী ওলোট-পালোটের খবর নিয়ে গ্রামে ফিরে সে দেখল তার বড় ভাই-এর প্রথম পুত্র সন্তান হয়েছে।

শিউশংকরের বারো বছর বয়সে এই কাকাই তাকে প্রথম হাওড়ায় নিয়ে আসে।

গ্রামের মিড্‌ল স্কুলে সাত ক্লাশে পড়তে পড়তে শিউশংকর কাকার সংগে কালিবাবুর বাজারে এক মাংসের দোকানে এসে উঠল। পাশেই আকলু রাম-এর পান-বিড়ির দোকান। আকলুরাম আর কসাই রামবিলাস দুজনেই একই গ্রামের লোক। রামপ্রসাদ ভাইপোকে কোচোয়ান না করে ড্রাইভারী শেখাবে—এই ইচ্ছে নিয়েই শিউশংকরকে এই দুই গ্রামবাসীর হাতে সঁপে দিল।

গোটা হাওড়ায় তখন মোটর গাড়ীর মালিকের সংখ্যা গাঁটে

শোনা যায়। তারই মধ্যে দুর্লভ চাটুজ্যে একজন।

রামবিলাসের মাংসের দোকান থেকে এই দুর্লভ চাটুজ্যের বাড়ীতে সপ্তাহে তিনদিন মাংস যেত। রামবিলাস একদিন এই মাংসের ঝোলার সংগে শিউশংকরকেও পাঠিয়ে দিল দুর্লভ চাটুজ্যের কাছে।

দুর্লভ চাটুজ্যের ছোট্ট গাড়ী। কিন্তু বড় আদরের। বড় যত্নের। প্রথম প্রথম খুব সকালে উঠে গামছা পরে মগে করে জল ঢেলে ঢেলে নিজের হাতে সাবান মাখিয়ে গাড়ীকে চান করিয়ে তবে নিজে চান করত দুর্লভ চাটুজ্যে। এতে তার সম্মানের হানি হত। কিন্তু দুর্লভ চাটুজ্যে বলত, এ গাড়ী আমার ছেলের মত। আমার সাত-সাতটা ছেলে আমায় ছেড়ে চলে গেলে আমি যত না দুঃখ পাবো তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ পাবো এই গাড়ীটাকে হারালে। এই গাড়ী আমার লক্ষ্মী।

বিল্ডিং কনট্রাকটর দুর্লভ চাটুজ্যে তাই যার তার হাতে তার অষ্টম পুত্রের এই গাড়ীটির দেখা শোনার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারত না। কিন্তু শিউশংকরকে দেখে তার যেন কেমন ভরসা হল। দু-একদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার কাজ দেখে খুশি হয়ে তাকেই কেয়ারটেকার করে দিল।

বারো বছরের বিহারী কিশোর শিউশংকর চাকরী পেয়েই রামবিলাসের মাংসের দোকান ছেড়ে টিকেপাড়ায় কাকার আস্তাবলে এসে উঠল।

এই আস্তাবলেই ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে শুয়ে শুয়ে কাকার সংগে গল্প করত শিউশংকর। কাকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাজের হিসেব নিত। ড্রাইভারী শেখা কতদূর এগোলো। গাড়ীর যন্ত্রপাতি চেনার কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। দুর্লভবাবুর ড্রাইভার বিষ্টু দত্ত কোন দুর্ব্যবহার করছে কিনা।

শিউশংকর খুশি মনে উত্তর দিত, তার ভাগ্য খুব ভাল। দুর্লভ বাবু তাকে খুব ভালবাসে। গাড়ীর চকচকে বডি দেখলেই খুশি

হয়ে সিকিটা আধুলিটা তাকে বকশিশ দেয়। মাইনের টাকা শিউশংকর তো বাড়ীতে পাঠাবার জন্য কাকার হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এই বকশিশের টাকা সে ক্যাভেণ্ডার সিগারেটের টিনের মাথায় গর্ত করে তার ভেতর জমায়। এই পয়সা জমিয়ে সে ড্রাইভারের লাইসেন্স পাবার সময় খরচ করবে।

রামপ্রসাদ আশা দেয়। বেশ, এইভাবে পয়সা জমিয়ে সে যদি সত্যি সত্যিই লাইসেন্স নিতে পারে তবে যেমন করেই হোক তাকে একটা ভালো ড্রাইভারীর চাকরী সে জোগাড় করে দেবে।

শিউশংকর তার কথা রেখেছিল। লাইসেন্স পেয়েই কাকাকে পাগড়াও করল। তখন দুর্লভ বাবুরই চেষ্টায় সে প্রথম কলকাতায় গাড়ী চালাবার চাকরী পেল।

শিউশংকর তখন যুবক। কলকাতা আর হাওড়ার মাঝের গঙ্গায় তখন কাঠের পুল। সেই পুল পেরিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে শ্যামবাজারে ড্রাইভারী করতে যেত।

কিন্তু ড্রাইভার হয়েও ড্রাইভারীতে মন নেই শিউশংকরের। তার মন চায় ব্যবসা করতে। এই মোটর গাড়ীরই ব্যবসা। পুরানো গাড়ী কিনে রং করে আবার নতুন করে বিক্রি করা।

শিউশংকর স্বপ্ন দেখে। আর সেই স্বপ্নের কথা শুনে তার কোচোয়ান কাকা ঘোড়ার গাড়ীর তালে তালে তাল খোঁজে। কি ভাবে ভাইপোকে একখানা পুরানো গাড়ী কিনে দেওয়া যায়।

ভাবতে ভাবতেই খোঁজ-খবরের চেষ্টা। আর খোঁজ-খবর করতে করতেই সুযোগ এল। খিদিরপুরের এক সাহেবের মোটর গাড়ী বিক্রি আছে।

রামপ্রসাদ খবরটা পেয়েই ভাইপোকে সংগে নিয়ে দেশে এসে হাজির হল।

শিউশংকরের একমাত্র কাকা রামপ্রসাদ। পৈতৃক বিঘে পাঁচেক জমি আছে তাদের। রামপ্রসাদ বিয়ে সাদী করে নি। ঘোড়ার পিঠে

চাবুক চালিয়েই জীবনের অর্ধেক পরমায়ু শেষ করেছে। বাকী জীবন ভাইপোকে নিয়ে কাটাবার ইচ্ছা।

বড় ভাই-এর সামনে ভাইপোকে বসিয়ে রামপ্রসাদ প্রস্তাব তুলল, জমি বিক্রি করে গাড়ী কেনা হবে।

শিউশংকরের বাবা রাজী হলো না। মাথার ওপর দু-দুটো মেয়ে। আরও একটা ছেলে রয়েছে—তার লেখাপড়া ভবিষ্যৎ আছে। ঐ জমিটুকু গেলে এসব কাজ কি করে হবে !

রামপ্রসাদ আশ্বাস দিল, ব্যবসা চালু হলে ভবিষ্যতে টাকার অভাব হবে না।

বড়ভাই তবু ভরসা পেল না। মোটর গাড়ী সে জীবনে দেখে নি। যা চোখেই দেখে নি তা নিয়ে ব্যবসা করার লাভ লোকসানের সে কিছুই বোঝে না।

অগত্যা দু ভাই-এর মধ্যে ঝগড়া, চিৎকার। শেষে ঠিক হল জমি ভাগ হবে।

তখনি আমিন ডাকা হ'ল। রাত্তিরে কেরোসিনের আলো জ্বেলে এপাশ থেকে ওপাশে লম্বা ফিতে পড়ল।

পরদিন সকালেই দলিল রেজেষ্ট্রী হ'ল। আমিন নিজেই কিনে নিল।

জমি বেচা টাকা ট্যাঁকে পুরে আর ভাইপোকে সংগে নিয়ে রামপ্রসাদ হাওড়ায় ফিরল।

পরের দিনই ভাইপোকে পাশে বসিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে খিদিরপুরের দিকে গাড়ী ছোটাল রামপ্রসাদ।

কিন্তু হাওড়ার পুলের অর্ধেক উঠেই ঘোড়াদুটো সামনের পা তুলে চিৎকার করে উঠল।

কি ব্যাপার ! কাতারে কাতারে মেয়ে-পুরুষ কলকাতা ছেড়ে হাওড়ায় পালিয়ে আসছে। হাতিবাগানে আর খিদিরপুরে জাপানীরা নাকি বোমা ফেলেছে।

বোমা! খোদ খিদিরপুরেই বোমা! চমকে উঠল শিউশংকর! চমকে উঠল তার কাকা। গাড়ী কেনা মাথায় উঠল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে হাওড়ার দিকে করে আবার টিকেপাড়ায় ফিরে আসতে হ'ল।

কিন্তু এখানে এসেও নিস্তার নেই। জাপানীরা বোমা নিয়ে পেছনে পেছনে তাড়া করল। বার্ন কোম্পানীর গেটে একটা বোমা এসে পড়ল। কিন্তু ফাটল না।

এবার দলে দলে লোক ছুটল বোমা দেখতে।

কাকার সংগে শিউশংকরও গেল। ফিরে আসার সময় রামবিলাস আর আকুলরাম-এর সংগে দেখা হ'ল। ওরা দোকান বন্ধ করে বিহারে ফিরে যাচ্ছে। শিউশংকরের কাকাও ভাইপোকে নিয়ে ওদের সংগী হতে চাইল।

শিউশংকর কেঁদে ফেলল। না। না। এখন সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না। তাহলে গাড়ী কেনার এমন সুযোগ সে আর জীবনে পাবে না।

কিন্তু তখন সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ সুরু হয়েছে। গাড়ী বাড়ী ছেড়ে প্রাণ বাচাতেই তখন সবাই ছুটছে।

নিরুপায় শিউশংকরকেও দলে পড়ে ছুটতে হ'ল। কিন্তু মন তার পড়ে রইল খিদিরপুরের সাহেবের মোটর গাড়ীটার দিকে।

সে সব দিনের কথা কোনদিন শিউশংকর মিশ্র ভুলতে পারবে না। বোমার ভয়ে সেবার হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা, বুড়ো সবাইকে। পথে আশ্রয় মিলেছে, খাদ্যও মিলেছে।

শিউশংকর মিশ্র ভাবে, কতদিনেরই বা কথা। অথচ মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন। এত বড় বিপদের সময়েও মানুষের মনে তখন কত দয়া-মায়া, কত দান-ধ্যান, কত রকমের সাহায্য। শিউশংকরের মনে পড়ে বর্ধমানের পথে যেতে মেমারির সেই বাঙালী বাবুর কথা।

বোমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পালিয়ে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের কাছে গলায় গামছা দিয়ে সেই বাঙালী বাবুর কাতর প্রার্থনা, ভয় পাবেন না। অস্থির হবেন না। এখানে বসুন। খানিক বিশ্রাম করুন। হাতে মুখে জল দিয়ে পেটভরে চারটি খেয়ে নিন।

শিউশংকর অবাক। হাজার হাজার বাঙালী, অবাঙালী, ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত মানুষ অবাক! কে এই বাঙালী বাবু? ইনি কি মানুষ না দেবতা!

লাইন দিয়ে বড় বড় কড়ায় মন মন চাল-ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি হচ্ছে। পাশেই পুঁই শাকের চচ্চড়ী। লম্বা লাইনে প্রায় জোর করে চেপে বসিয়ে দিচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকেরা।

সে কি অদ্ভুত, অভাবনীয় দৃশ্য! সে কি দয়ার্দ্র হৃদয়! সে কি করুণাময় মূর্তি!

কাকার পাশে বসে শিউশংকরও খিচুড়ি খাচ্ছে। পরিশ্রান্ত দেহে তখন রাক্ষুসে খিদে। শিউশংকর গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

এমন সময় মোটরের শব্দ।

সেই বাঙালী বাবুরই গাড়ী। আরও চাল-ডাল আসছে। শাক-সবজী নামছে গাড়ী থেকে।

মালপত্র নামিয়ে দিয়ে গাড়ী আবার ফিরে যাচ্ছে বাজারে। আবার জিনিষ নিয়ে এখুনি ফিরতে হবে।

কিন্তু গাড়ীর একি হল! গাড়ী আর চলে না। যন্ত্রপাতিতে গোলমাল দেখা দিয়েছে।

তখন একে ডাক, ওকে ডাক। কিন্তু ডাকলেই পাওয়া যায় না। কাছাকাছি যে কজন মিস্ত্রী ছিল সব বোমার ভয়ে উধাও।

খাওয়া ছেড়ে শিউশংকর উঠে দাঁড়াল। সেই বাঙালী দেবতার কাছে হাত জোড় করে নিজের পরিচয় দিয়ে গাড়ীর যন্ত্রপাতি ঠিক করতে বসল।

শিউশংকর কৃতকার্য হল। ঘণ্টা চারেক চেষ্টার পর গাড়ী আবার

চলতে শুরু করল।

কিন্তু শিউশংকর মিশ্র আর চলতে পারল না। সেই বাঙালী বাবুর কাছে বাঁধা পড়ে গেল।

তারপর অনেক কথা, অনেক ঘটনা।

এরপর শিউশংকরকে আর খিদিরপুরের সাহেবের কাছে গাড়ী কেনার জন্য ধন্যে দিতে হয়নি। এই বাঙালী বাবুই একদিন নামমাত্র মূল্যে নিজের গাড়ীখানা শিউশংকরের কাছে বিক্রী করে দিলেন।

কথায় বলে, যে খায় চিনি তাকে যোগায় চিন্তামনি। শিউশংকরের কাছে এই বাঙালী বাবুই হ'ল চিন্তামনি।

গাড়ী পেয়েই শিউশংকর মিশ্র গ্যারেজ খুলে বসল। ছোট গ্যারেজ। মিস্ত্রী থেকে ম্যানেজারী সব কাজই নিজে হাতে করতে হয়।

তবু ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই—শুধু কাজ আর কাজ।

এদিকে ভারত জুড়ে তখন বিয়াল্লিশের আন্দোলন। দেশময় এক চরম বিশৃঙ্খলা। ব্রিটিশ সরকারের সম্পত্তি, রেলপথ, তারের লাইন আর থানায় থানায় আগুন। অপরপক্ষে পুলিশের অত্যাচার, সেনাবাহিনীর গুলিতে শত শত ভারতবাসীর প্রাণনাশ।

শিউশংকর মিশ্রের স্বপ্ন বার বার ভেঙ্গে যায়। ব্যবসার বাজার মন্দা। বিশেষ করে এ সময় মোটর গাড়ী কেনবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। শিউংশকরের মন ভেঙ্গে যায়। তবে কি এত চেষ্টা বিফল হবে! তার গাড়ী কি তাহলে বিক্রী হবে না।

হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল।

দুর্লভ চাটুজ্যের সংগে বাসুদেব আগরওয়ালার চেনাজানা ছিল। কথায় কথায় একদিন দুর্লভ বাবুই আগরওয়ালাকে শিউশংকরের গাড়ীর কথা বলল।

বলার সংগে সংগেই কাজ হ'ল। বাসুদেব আগরওয়ালা নিজেই শিউশংকরের টিকেপাড়ার গ্যারেজে এসে গাড়ী দেখে বায়না করে গেল।

শিউশংকরের প্রথম নতুন গাড়ীর চাকা চলতে শুরু করল। তার ভাগ্যের চাকাও বুঝি ঘুরে গেল। এমন দুঃসময়ে দেড়া দামে গাড়ীটা কিনে নিয়ে বাসুদেব আগরওয়ালা চৌরঙ্গীর শো-রুমে সাজিয়ে রাখল।

এরই মধ্যে বাজার আরও পড়তে সুরু করল। গাড়ীর দাম হু হু করে কমে গেল। বাসুদেব আগরওয়ালার খাবারে রুচি নেই, রাতে ঘুম নেই। নিজের গাড়ীতে শিউশংকর মিশ্রকে বসিয়ে সে টালা থেকে টালিগঞ্জ ঘুরে ঘুরে গাড়ী কিনতে লাগল। শিউশংকর তখন পাকা মিস্ত্রী। গাড়ীর আওয়াজ শুনেই রোগ ধরে দেয়। আগরওয়ালার সংগে তার চুক্তি হ'ল, সমস্ত পুরোনো গাড়ী সারিয়ে নতুন করার কাজ পেল সে।

এমনি ভাবেই কাটছিল। হঠাৎ এক আগষ্টের সন্ধ্যায় কলকাতা মহানগরীতে এক ব্যাপক দাঙ্গা ও গুণ্ডাবাজী আরম্ভ হয়ে গেল।

সে সময় শিউশংকর মিশ্র বাসুদেব আগরওয়ালার কাছে কাজে এসেছিল। ফেরার পথে হাওড়ার ফাঁসিতলার কাছে এসে আটকা পড়ে গেল। একটু দূরেই পথের ওপর দাঙ্গা চলছে।

ভয় পেয়ে শিউশংকর ছুটে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকেই রামকিশন বাজোরিয়াকে দেখতে পেল।

এক বন্ধুর সংগে রামকিশন সালকিয়া গিয়েছিল। বন্ধু সালকিয়ায় রয়ে গেছে। রামকিশন মিষ্টি খেতে দোকানে ঢুকে আটকা পড়ে গেছে।

দোকানে বসেই শিউশংকরের সংগে বাজোরিয়ার প্রথম আলাপ হ'ল।

প্রায় তিনঘণ্টা পর দোকান থেকে বেরিয়ে বাজোরিয়া দেখল কলকাতায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব। দাঙ্গা ক্রমশঃই ব্যাপক আকার ধারণ করছে।

অগত্যা প্রাণ বাঁচাতে শিউশংকর মিশ্রের পিছু পিছু অন্ধকারে

গা ঢাকা দিয়ে রামকিশন বাজোরিয়া টিকেপাড়ার বস্তিতে এসে উঠল।

টিকেপাড়ার যে বাড়ীতে শিউশংকর তার কাকার সংগে থাকত সেখানে প্রায় দেড়শো বিহারী ছিল। বাড়ীর মালিক ছিল শেখ্ জলিল। সাম্প্রদায়িক এ দাঙ্গায় নিজে মুসলমান হয়েও এতগুলো হিন্দু বিহারীর প্রাণ বাঁচাতে শ্যালক কবীর খানকে নিয়ে বন্দুক হাতে সদব দরজায় পাহারায় বসলো।

সাতদিন সাতরাত কেটে গেল। দেড়শো জন বিহারীর সংগে রাজস্থানের বামকিশনও টিকেপাড়ার এই বাড়ীর মধ্যে বসে বসে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুব আশংকা কবতে লাগল। এমন দুর্বিপাকে সে কখনও পড়ে নি। ভাগ্যিস শিউশংকব মিশ্রের সংগে তার আলাপ হয়েছিল। নইলে এতক্ষণে হয়ত প্রাণরক্ষাই দায় হত।

এদিকে বাইবে তখন তুলকালাম কাণ্ড। টিকেপাড়ার বস্তিতে তখন মুসলমানেব ছড়াছড়ি। শেখ জলিল ভাল বুঝল না। তার নিজের বন্দুকে আর কটা গুলি ধরবে। এদিকে অগুণতি মুসল-মানদের হাত থেকে হিন্দু ভাড়াটের দলকে বুঝি বাঁচানো গেল না।

অগত্যা গোপনে গোপনে পুলিশ ফাঁড়িতে খবর গেল।

পবেব দিন সকালে তিন গাড়ী মিলিটারী এসে জলিলের গোটা বাড়ী ঘিরে ফেলল। কিছুক্ষণেব মধ্যেই দেডশো জন বিহারী সর্বস্ব ফেলে রেখে একবস্ত্রে বাড়ীব বাইরে এসে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে সাতদিন পব সূর্যের আলো দেখল।

দু-পাশে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মিলিটাবী পাহারা। মাঝে দেড়শো বিহারীর সংগে রামকিশন বাজোরিয়া হাঁটতে হাঁটতে টিকেপাড়া থেকে হাওড়া ষ্টেশনে এসে পৌছল।

শিউশংকর মিশ্র অন্য সকলের সংগে ট্রেনে চেপে বসল। আর রামকিশন বাজোরিয়া পুলিশের গাড়ী করে কলকাতায় ফিরে গেল।

দাঙ্গা মোটামুটি শান্ত হতে শিউশংকর কলকাতায় ফিরেই বাসুদেব আগরওয়ালার সংগে দেখা করে আবার কাজ সুরু করল। এবার তার সংগে এসে হাত মেলাল রামকিশন বাজোরিয়া। শিউশংকর মিশ্র তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। তার প্রতি বাজোরিয়ার তাই কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

পরে বয়স বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগও বেড়েছে। তাই দায়িত্বও বেড়েছে। ড্রাইভার থেকে ইনচার্জ, ইনচার্জ থেকে কনট্রাকটার। কিন্তু সব অবস্থাতেই মিশ্রজী অতীতকে মনে রেখেছে। আর মনে রেখেছে ড্রাইভারদের। এখন শিউশংকর-বাবুকে পুরোপুরি মালিকপক্ষই বলতে হবে। কিন্তু ড্রাইভাররা তাকে নিজের লোক বলেই মনে করে। তারা জানে, কলকাতা বলো, বোম্বাই বলো, টাটা বলো, আর অন্য কোথাও বলো কনভয় ইনচার্জের অভাব নেই। কিন্তু মিশ্রজী মিশ্রজীই। তার সঙ্গে কারোর তুলনা চলে না। সাধারণ ভাবে মিশ্রজী একটু বেশী আইন মেনে চলে। কিন্তু তাতে ভাল ছাড়া মন্দ কখনো হয় না। ড্রাইভাররা জানে, মিশ্রজীর সঙ্গে কনভয়ে বেরিয়ে নিয়ম মানা মানেই স্বয়ং মিশ্রজীকে মেনে চলা। তাতেই মিশ্রজী খুশী। আর মিশ্রজী খুশী হওয়া মানেই কিছু বাড়তি সুযোগ।

এই বাড়তি সুযোগ মানে শুধু টাকা পয়সা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কনভয় ড্রাইভারদের ভবিষ্যৎ। মিশ্রজী তা নিয়ে চিন্তা করে, ড্রাইভারদের মতামত নেয়, ইউনিয়নের লিডারদের সঙ্গে আলোচনা করে।

সত্যি! ভাববারই কথা। কি আছে এই কনভয় ড্রাইভারদের। না আছে বর্তমান, না আছে ভবিষ্যৎ। এ যেন শুধু দিনগত পাপক্ষয়।

ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা, হোটেলে খাওয়া আর গোনাগুনতি টাকা নিয়ে আবার লাইনে দাঁড়ানো। এখানে ফেলো কড়ি মাখো তেল। নো ওয়ার্ক নো পে। কাজ করো পয়সা নাও। কাজ নেই তো পয়সাও নেই। কিন্তু সংসার তা বোঝে না। তার দরকার পয়সার। পয়সা নেই তো সংসারও নেই। রোগ-শোক, আপদ-বিপদ, রেশনের চাল, কেরোসিন তেল—সবেতেই পয়সা। নগদ পয়সা চাই। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া কিংবা তাদের ভবিষ্যৎ শিকেয় তুলে রাখো। ড্রাইভারের ছেলের আবার ভবিষ্যৎ। তার মেয়ের আবার বিয়ে। এর ওপর নেশা। খৈনী থেকে সুরু ক'রে মদ পর্য্যন্ত। এরমধ্যে হরেক রকম। বিড়ি-সিগারেট, গাঁজা-আফিম, তামাক-চণ্ডু, তাড়ি-মদ, তাস-পাশা। আরও আছে। ভাবা যায় না কি জঘন্য এই জীবন। আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যৎ নেই।

তাহলে আছেটা কি? আছে অভাব। আছে অশান্তি। আছে দুঃখ। আছে কান্না।

ড্রাইভাররা কাঁদে। জ্ঞানে-অজ্ঞানে। পেশায়-নেশায়। আড়ালে-প্রকাশ্যে। কেউ শোনে কেউ শোনে না। শিউশংকর মিশ্র কিন্তু শোনে। কান পেতে শোনে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ—সবাই কাঁদে। গোটা ভারতবর্ষ কাঁদে। মিশ্রজী ভাবে, এত কান্না! এর কি প্রতিকার হবে না? এদের কি কেউ নেই? ইউনিয়ন নেই, সরকার নেই, মালিক নেই, ম্যানুফ্যাকচারার নেই, ঠিকাদার নেই।

আছে। সবই আছে। ড্রাইভারদের ইউনিয়ন আছে। সেখানে বছরে বছরে চাঁদা আদায় আছে। নিয়ম-কানুন আছে। হুমকি আছে। চাকরী যাবার নিশ্চয়তা আছে।

আছে। সরকার আছে। সেখানে মোটর ভিকেল্‌স এ্যাক্ট আছে। লাইসেন্স ফি আছে। ট্রাফিক সাইন আছে। রোড

সিগন্যাল আছে।

এরকম অনেক কিছুই আছে। কিন্তু কোথাও ড্রাইভারদের অভাব-অভিযোগের সুরাহার রাস্তা নেই। লোন নেই, ইনসিওরেন্স নেই, কো-অপারেটিভ নেই, বোনাস নেই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কনভয় ড্রাইভাররা আছে। আর আছে শিউ-শংকর মিশ্রের মত কনভয় ইনচার্জ। তাই সময়ে-অসময়ে অনেক ড্রাইভারই চোখের জল গোপন করে মিশ্রজীর কাছে হাত পাতে। শিউশংকরবাবু কান্না পছন্দ করে না। কাউকে কাঁদতে দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে, রোও মত্। কিত্না মাংতা? দশ, বিশ, পঁচিশ বড় জোর পঞ্চাশ। এর বেশী ওঠার ক্ষমতা নেই মিশ্রজীর। অনেক ড্রাইভার। তাদের অনেক রকমের সমস্যা। সব সমস্যারই সমাধান—অর্থ। কিন্তু শিউশংকর মিশ্রের সামর্থ ঐ পর্য্যন্ত। দেশে বিরাট সংসার তার। এক নিজের। তার ওপর মেজ ভায়ের। অল্প বয়সে ভাই মারা গেছে। তার চার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ মিশ্রজীর ওপর। তবু মিশ্রজীর চেষ্টার ক্রটি নেই। তার উপকারের তুলনা নেই। ড্রাইভাররা যে অবস্থাতেই থাকুক। কখনো কেউ মিশ্রজীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। প্রতিটি ড্রাইভারই কোন না কোন ব্যাপারে মিশ্রজীর কাছে ঋণী। তাই কৃতজ্ঞতার ভারে তাদের মাথা সব সময়েই নিচের দিকে নামানো।

পরের দিন ভোর হ'ল। আজ আর ইনচার্জের বাঁশি শোনবার দরকার হয় নি কিংবা ব্যানার্জীকে এসেও ডাকাডাকি করতে হয় নি। আজ পঞ্চবটীর গাছে গাছে অসংখ্য জানা-অজানা পাখীর কল-কূজন

অনেক আগেই আমায় জাগিয়ে দিয়েছে। আজ সকলের আগে আমি উঠেছি। গাড়ী ছেড়ে আশেপাশে একটু ঘুরে বেড়িয়েছি। এই প্রভাতে নির্জন বনমধ্যে মারীচের মত হরিণ সেজে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে ছুটে যাই গোদাবরীর তীরে। শুনেছি এই নাসিকেই সহ্যপর্বত থেকে বেরিয়ে গোদাবরী ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। আশপাশে তাকিয়ে দূরে দূরে ছোট বড় অনেকগুলি উঁচু উঁচু পাহাড়ের মত দেখছি। কি জানি ওরই মধ্যে কোনটা হয়ত সহ্য পর্বত। যার গর্ভে জন্ম নিয়ে নদী গোদাবরী পেয়েছিল অপরিসীম সহাশক্তি। নইলে তারই তীরে পাতার কুটীর থেকে রাবণ রাজা সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেল আর মূক অসহায় নদী গোদাবরীকে তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে হ'ল।

দূরে কোথাও সূর্য উঠলো। ঘন গাছের ডালপালার আচ্ছাদন মাথার ওপর আকাশকে আড়াল করে রেখেছে। তারই ফাঁক দিয়ে রোদ এসে গায়ে লাগল।

ঘড়ি দেখলাম। ছ'টা পাঁচ। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বন থেকে বাইরে এলাম। সওয়া ছটার মধ্যে গাড়ী লাইনিং হবে। ব্যানার্জী নিশ্চয়ই আমাকে খোঁজাখুঁজি করবে।

গাড়ীর কাছে ফিরে আসতে সাত মিনিট লাগল। ঘড়িতে ছ'টা বারো। কিন্তু কই! কোন ব্যস্ততা নেই। কোন চাঞ্চল্য নেই। ড্রাইভাররা এখনো মন্থর গতিতে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্য-দিনের মত ছোটাছুটি, হাঁকডাক, ইঞ্জিনের শব্দ কিছুই নেই। পঞ্চবটীর নির্জনতা যেন কনভয়ের ড্রাইভারদেরও প্রভাবিত করেছে। ব্যানার্জী বোনেটের ওপর বসে বেশ আয়াশ করে চা-এর গ্লাশে চুমুক দিচ্ছে। লিডিং মাষ্টার নন্দলালকে দেখলাম গাড়ীর আড়ালে শরীর চর্চা করছে। যতিন মিস্ত্রী পেট্রোল ঢেলে শুকনো কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে হাতের ময়লা তুলছে। সকালের কাঁচা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে মিশ্রজী ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ব্যানার্জী

তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে বলল, কোথায় গেসলেন ? চা খাবেন তো ?

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

ব্যানার্জী দ্রুতপায়ে সামনের চা-এর দোকান থেকে চা এনে দিল।

পঞ্চবটীর মাটিতে একদিন স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পা পড়েছিল। মাটি তাই ধন্য। আর পঞ্চবটীর চায়ে মা জানকীর হাতের স্পর্শ লেগেছিল কিনা জানি না। এখানকার চা অমৃত।

চা-এ চুমুক দিয়ে ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করলাম, আজ গাড়ী ছাড়তে এত দেরী হচ্ছে কেন ?

ব্যানার্জী বলল, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা নাসিকে এসে গেছি। আর তাড়া নেই। এবার ধীরে ধীরে গেলেই হ'ল।

অবশেষে ধীরে ধীরেই গাড়ী ছাড়ল। দু-ঘণ্টা লেটে। সাড়ে ছটার জায়গায় সাড়ে আটটায়।

ব্যানার্জী বোধহয় সকালে উঠেই চান করে নিয়েছে। তেল চকচকে মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। কদিন পর আজই প্রথম দেখলাম জামা-কাপড় পাল্টে একটু সভ্য হয়েছে। শুধু দাড়িটাই কামায় নি।

কনভয়ে বেরিয়ে শরীরের দিকে নজর দেবার সময় পায় না ড্রাইভারেরা। রাস্তাতেই চান করা, রাস্তাতেই ঘুমানো। নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই। খাওয়ার কোন সঠিক সময়ও নেই। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। এ লাইনে কেউ সময়ের বাবু এলে তার অনেক অসুবিধে। সেইজন্য যারা এক জায়গায় চাকরী করতে অভ্যস্ত কনভয় লাইন তাদের সহ্য হয় না। বিশেষ করে পেটের গোলমালে তারা নিশ্চয়ই ভুগবে।

ব্যানার্জীরও পেটের গোলমাল। লিভার বেড়েছে। হোটেলে খাওয়া একেবারে বারন। তেল ঝাল বাদ দিয়ে সেদ্ধ খাওয়ার কথা।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ডাক্তাররা অমন বলে। তাদের তো আর কনভয়ে গাড়ী চালাতে হয় না। তাই পথ্য মাথায় থাকে। ওষুধটাই চলে। পেটেন্ট ওষুধ। বছর ভোর খেয়ে যাও। দু-রকমের বড়ি। খাওয়ার আগে আর খাওয়ার পরে।

গাড়ী মন্থর গতিতে চলেছে।

এই দু'দিনে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল। অনেক অভিজ্ঞতাও হ'ল। বিশেষ করে ড্রাইভারদের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেল। যতিন মিস্ত্রীর বড় ছেলে, মুক্তি ঝা-র ভাই, রবার্ট উইলশনের চামেলি, মহম্মদ আলির বহিন এদের কথা জানতে পারলাম। কত আশা, কত আনন্দ, কত ব্যথা, কত দুঃখ আমার চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন তাই ব্যথায় পাণ্ডুর। তবু কৌতূহল। তবু জানার আগ্রহ। সবচেয়ে রহস্যময় মানুষের জীবন। তার চেয়েও মন। ঘণ্টার হিসাবে সেঞ্চুরি পেরিয়ে গেছে। ব্যানার্জীকে দেখছি, একসঙ্গে পথ চলছি, কথা বলছি। তবু তাকে জানতে পারছি না। তার মনের সন্ধান পাচ্ছি না। অদম্য কৌতূহল। বাধা মানতে চায় না। তবু মানাতে হয়। পরের সম্বন্ধে এত কৌতূহল ভাল নয়। এ রীতিমত অন্যায়। অগত্যা নিশ্চুপ। মুখে আঙুল দিয়ে মনের দরজা বন্ধ করে বসে বসে রাস্তার দু-পাশের দৃশ্য দেখি। সময় কেটে যায়। বেলা গড়িয়ে আসে। ছায়াকাঠির ছায়া ছোট হতে হতে কাঠিতে মিশে যায়। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী তার পরিক্রমার অর্দ্ধাংশ শেষ করে। ঘড়িতে বেলা বারোটা বাজে। সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ পেরিয়ে ভিওয়াণ্ডিতে এসে হাজির হই।

আজকের লাঞ্চ। একেবারে সাহেবী খানায়। মিশ্রজী কোন

কথাই শুনলেন না। সেদিন রায়পুরে আমায় নিমন্ত্রণ করেও তিনি খাওয়াতে পারেন নি। আজ বিনা নিমন্ত্রণে ডবল খাইয়ে সেদিনের পাওনা উসুল করে দিলেন।

আজ সকলের খাওয়া-দাওয়া সারতে সবচেয়ে বেশী সময় লাগল।

শিউশংকর মিশ্র বেলা ছুটো নাগাদ বিশ্রাম সেরে চরণ সিং কে সংগে নিয়ে কাছাকাছি কোথায় যেন ফোন করতে গেলো। এখান থেকে তাকে দু-জায়গায় ফোন করতে হবে। প্রথম, ষোল কিলোমিটার দূরে থানায়। দ্বিতীয়, সাতচল্লিশ কিলোমিটার দূরে বোম্বাই-এ। থানায় গাড়ী চেক হবে। বোম্বাই-এ ঢোকার আগে প্রভিশনাল মিউনিসিপ্যালিটির পারমিশান চাই। থানায় সেই পারমিশন পাওয়া যাবে। ওখানে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। তাই আগেভাগে জানিয়ে রাখলে কাজ তাড়াতাড়ি হয়। বোম্বাই-এ মিষ্টার বাসুদেব আগরওয়ালা এ্যাণ্ড কোম্পানীর ব্রাঞ্চ অফিস। সেখানে ম্যানেজার পালবাবু। শ্রীসুদর্শন পাল।

মিশ্রজী ফোন করে পাল বাবুকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি গাড়ী নিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বোম্বাই পৌঁছাচ্ছেন। অতএব গাড়ী রাখার জায়গা যেন ঠিক থাকে।

বেলা আড়াইটে। আবার যাত্রা হ'ল শুরু। অল্পক্ষণের মধ্যেই থানা এসে গেল। কিন্তু একি! আমাদের আগেই যে অনেক গাড়ীর লাইন পড়ে গেছে। তাহলে আর ফোন করে লাভ কি হল। কুচ্ পরোয়া। হাতে অঢেল সময়। ষ্টার্ট বন্ধ করে ড্রাইভাররা বিড়ি সিগারেট ধরাল। মিশ্রজীকে দেখলাম লিডিং মাষ্টার নন্দলালকে পেরিয়ে একেবারে সামনে গাড়ী দাঁড় করাল। অনেক গাড়ী। অনেক লোকজন। জায়গাটা গমগম করছে।

এক প্রাচীন পর্তুগীজ ঘাঁটি এই থানা। হুগলীর চন্দননগরের কথা মনে পড়ল। সেখানেও পর্তুগীজদের আস্তানা ছিল। থানায় আজও কয়েকটা পর্তুগীজ কুটির রয়েছে। একটি কেল্লা, আর ইংরেজ-

দের একটি উপাসনা গৃহ পুরানো দিনের সাক্ষী হয়ে আজও বিরাজ করছে।

আমি বা ব্যানার্জী কেউ গাড়ী থেকে নামলাম না। কি লাভ নেমে। এই তো আধঘণ্টা আগে গাড়ীতে চেপেছি। তার চেয়ে গল্প করা যাক।

গল্প! কিসের গল্প? ব্যানার্জীর জীবনের গল্প? তার ড্রাইভারী জীবনের ইতিহাস? আবার অন্যায় কৌতূহল। আবার নিন্দনীয় পরচর্চা। কিন্তু একে পরচর্চাই বা বলবো কেন? ব্যানার্জী কি আমাকে পর ভাবে? না, কখনোই নয়। মহম্মদ আলি তো বলেছে, এ বাবুজী সব কোইকা হ্যায়। অর্থাৎ আমি সকলের। তবে আবার পর ভাবাভাবি কেন? তাছাড়া আগে যদিও বা পর ছিলাম। এখন আপন হ'য়ে গেছি। পর ভাবলেই পর। আপন ভাবলেই আপন। কথায় বলে সাত পা একসঙ্গে চললেই পর আপন হয়। আমরা তো দু-হাজার মাইল চললাম। তবে আর আপন হব না কেন?

ভাবতে ভাবতেই দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেল। গাড়ী থানা পেরিয়ে আবার বোম্বাই-এর দিকে এগিয়ে চলল।

পথ যত ফুরোচ্ছে বোম্বাই ততই এগিয়ে আসছে। শিউশংকর মিশ্র ততই হালকা হচ্ছে। ড্রাইভারদের চঞ্চলতা বাড়ছে। বোম্বাই পৌঁছোলেই পুরো পেমেণ্ট। তারপরেই খাও-পিও-জিও। ব্যানার্জীকে দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না। তার মন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুই জানি না।

আমার মন কিন্তু ক্রমশঃই ভারী হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন নীলকণ্ঠ হয়ে গেছি। সবাই তাদের দুঃখের কথা শুনিয়ে নিজেরা হালকা হয়েছে। আর আমি সকলের দুঃখ বুকে নিয়ে ভারী বোঝা হয়ে গেছি।

শহরতলি পার হয়ে গাড়ী ক্রমশঃই বোম্বাই শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এখন বত্রিশটা গাড়ী গায়ে গা লাগিয়ে চলছে। আর দূরে নয়। এবার কাছাকাছি এস। সামনে বিচ্ছেদের সময় আসছে। গাড়ী গ্যারেজে পুরে দিয়ে কে কোথায় চলে যাবে। কেউ কলকাতায় ফিরে যাবে। কেউ অন্যত্র। এখানেও অটোমবাইল এ্যাসোসিয়েশন আছে। আছে ড্রাইভারস ইউনিয়ন। ভাগ্য ভাল হ'লে ফিরতি পথে কিছু গাড়ীও মিলে যেতে পারে। ছোট ফিয়েট গাড়ী। বোম্বাই থেকে কলকাতা যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শহর। শহর বোম্বাই। এখনও বেশ বেলা রয়েছে। এ পথ সে পথ ঘুরে গাড়ী আগরওয়ালা এ্যাণ্ড কোম্পানীর ব্রাঞ্চ অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল।

শিউশংকরবাবু গাড়ী থেকে নেমেই ব্যাগ হাতে অফিসে ঢুকলেন। আমিও গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালাম। ব্যানার্জী হাত বাড়িয়ে ঝোলাটা দিল। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তা ছেড়ে ধারে এসে দাঁড়ালাম।

ড্রাইভারেরা কেউ নামল না। গাড়ী গ্যারেজ করে তবে তাদের ছুটি।

কোম্পানীর শো-রুমের উল্টোদিকে একটা মদের দোকান। বড় বড় বোতল ভর্তি সাদা তরল পদার্থে দোকান সাজান। সাদা মদ কখনো দেখি নি। মদ কি অন্য কিছু বুঝলাম না। দোকানের ভেতরে ও সামনে অনেকগুলো বেঞ্চ পাতা। খদ্দের নেই বললেই চলে। আমি বাইরের একটা বেঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

লম্বা গাড়ীর লাইন পড়েছে। এক এক করে গাড়ীগুলোকে শোরুমের পাশ দিয়ে একেবারে ভেতরে নিয়ে যেতে হচ্ছে। বিরাট

গ্যারেজ। অনেক গাড়ী ধরে। বত্রিশটা গাড়ী রাখার কোন অসুবিধেই হবে না।

ব্যানার্জী গাড়ী নিয়ে ভেতরে চলে গেল। পেছনে পেছনে ভ্রমর সিং, টুনা মাহাতো, উইলশন, গনেশ পাণ্ডে, মুক্তি ঝা, হানিফ, সার্দ্দুল সিং, আরও কয়েকজন। একসময় মহম্মদ আলিও ভেতরে চলে গেল।

গাড়ী গ্যারেজ করে ড্রাইভাররা ম্যানেজার সুদর্শন পালের সামনে মিশ্রজীর কাছ থেকে পাওনা টাকা নিয়ে কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

ব্যানার্জীও যথারীতি বেরিয়ে আসছিল হঠাৎ মিশ্রজী তাকে অপেক্ষা করতে বলল। অগত্যা ব্যানার্জী কাঁচের ঘরের মধ্যেই একপাশে সরে দাঁড়াল। মহম্মদ আলিকে দেখলাম। টাকাগুলো পর পর তিনবার গুণে মিলিয়ে পকেটে রাখল। তারপর খুবই কৃতজ্ঞ হয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে একবার মিশ্রজীকে আর একবার ম্যানেজার পালবাবুকে শ্যালুট করল।

পালবাবু হাতের ডট্ পেনটা কপালে ঠেকিয়ে প্রতিনমস্কার জানিয়ে মুচকে হাসলেন। আলি সাহেবকে তিনি চেনেন। তারই চেষ্টায় মহম্মদ আলি ড্রাইভারস ইউনিয়নে নাম লেখাতে পেরেছে।

আমি একইভাবে দাঁড়িয়ে আছি। হিন্দ মোটরে গাড়ী ছাড়ার পূর্ব-মুহূর্তে নিজেকে যেমন একা একা মনে হয়েছিল এখানেও তেমনি নিঃসঙ্গ লাগছে। ড্রাইভাররা এদিক সেদিক ঘুরছে। চা, পান, বিড়ি খাচ্ছে। কেউ কেউ ঝুপ করে মদের দোকানে ঢুকে আলমারির আড়ালে চলে যাচ্ছে। আমার যাবার জায়গা জহুরী মার্কেট। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়ী দু-চারদিন থেকে বোম্বাই দেখব। কিন্তু এখুনি যাবার উপায় নেই। মহম্মদ আলির মত আমারও কৃতজ্ঞতা জানানোর আছে। শিউশংকর মিশ্র, সন্তোষ ব্যানার্জী, মুক্তি ঝা, যতিন মিস্ত্রী, রবার্ট লুই উইলশন, মহম্মদ আলি—এদের সকলের

কাছেই আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। একুশশো কিলোমিটার পথে প্রায় একশো পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা আমি এদের সঙ্গে কাটিয়েছি। কত সুখ-দুঃখের গল্প, কত আশা-নিরাশার কথা। কেমন একটা আত্মীয়তা হ'য়ে গেছে যেন। এখন এরা অনেকেই আমার কাছে অনেক স্পষ্ট। আমি এদের বাইরেটা দেখতে চেয়েছিলাম। ওরা ওদের ভেতরটাও দেখিয়ে দিল। কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! কি রূঢ় বাস্তব! কি কঠিন সত্য!

রাস্তাটা বেশী চওড়া নয়। দুটো গাড়ী দু-দিক থেকে এসে পড়লে পথ-চলতি মানুষদের থেমে পড়তে হয়। তারই মধ্যে দু-ধারে দোকান, ফেরিওয়ালা আর গাড়ীব সারি।

মদের দোকানে ভীড় বাড়ছে। আমার লজ্জা লাগল। বুঝতে পারলাম আমার উপস্থিতি অনেককে অসুবিধেয় ফেলছে। একটু এগিয়ে একটা সরু গলির মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ দেখলাম বেশ কয়েকজন লোক হাতে ফুলের মালা নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে গলির ভেতর থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি সরে দাঁড়ালাম। লোকগুলো আমাকে পেরিয়ে আগরওয়ালা এ্যাণ্ড কোম্পানীর শো-রুমের দিকে এগিয়ে যেতেই আলিসাহেবকে দেখেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

শো-রুমের কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে এসেই মহম্মদ আলি থমকে দাঁড়াল। তারপর খুব আনন্দ হ'লে মানুষ যেমন হাসিতে ফেটে পড়ে সামনের লোকগুলোকে দেখে তেমনি ভাবে হেসে উঠল।

লোকগুলো চিৎকার করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মহম্মদ আলিকে হাসতে দেখে তারাও হেসে উঠল। তারপর সবাই মিলে দৌড়ে গিয়ে আলিসাহেবকে ঘিরে ধরল। সুরু হ'ল নাচ-গান-শিষ আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি। এরই মধ্যে যার হাতে ফুলের মালা ছিল সে তাড়াতাড়ি মালাটা আলিসাহেবের গলায় পরিয়ে দিতে গেল। আলি সাহেব হাসতে হাসতে ঘাড়টা নিচু করে মালাটা গলায় পরতে গিয়েও থমকে

দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এদিক সেদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

আমি একমনে সিনেমার ছবি দেখার মত মহম্মদ আলি আর তার সঙ্গের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি। এই প্রথম মহম্মদ আলিকে হাসতে দেখলাম। সারা মুখভর্তি শিশুর মত নির্মল হাসিতে বেশ মানিয়েছে মহম্মদকে। তার ডান দিকের গালের গভীর ক্ষত-চিহ্নটা আমার দিকে আড়াল করে আছে। তার ভয়ঙ্কর স্থির চোখের তারাদুটো চঞ্চল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার দিকে এসে আটকে গেল।

দু-হাত দিয়ে লোকগুলোকে ঠেলে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলল মহম্মদ। তারপর দ্রুত পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। পেছনে পেছনে সঙ্গের লোকগুলোও এসে হাজির।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। এত লোকজনের ভেতর আমার পরিচিত মহম্মদকে গুলিয়ে ফেলছি।

আলিসাহেব আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর নিতান্ত বিনীত ভাবে বলল, বাবুজী, ম্যায় আপকো বোলা না বোম্বাই মেরা রাজ হ্যায়। ইয়ে সব মেরা প্রজা হ্যায়। ইয়ে হ্যায় কালু, বিজয়, সুন্দর, আনন্দ, মুস্তাক,......। এক এক করে মহম্মদ আলি তার লোকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। জোড়হাতে মাথা হেঁট করে মহম্মদ আলির ভঙ্গিকে হুবহু নকল ক'রে ওরা আমায় অভিবাদন জানাল।

আমার নিজের কি করা উচিত ঠিক ভেবে পেলাম না। মহম্মদ আমায় যথেষ্ট সম্মান করে। মদ খেয়ে সে আমার পায়েও ধরেছিল। তার প্রজাদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর ঠিক কি ভাবে দেওয়া উচিত হবে মনে মনে সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু ভাবতে ভাবতেই অভিবাদন পর্ব শেষ হয়ে গেল। আলিসাহেব হঠাৎ ফুলের মালাটি কালুয়ার হাত থেকে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

বাবুজী, ইয়ে ফুল মেরা বহিন মেরে লিয়ে ভেজ দিয়া। লেকিন হামার বহিন জানে না যে কলকাতাসে দোসরা ভাইয়া আগিয়া। লিজিয়ে বাবুজী, মেরা বহিনকা পেয়ারকা নিশানা।

মহম্মদ নিজেই আমার হাতের মধ্যে ফুলের মালাটা ধরিয়ে দিল।

আমি যন্ত্রচালিতের মত হাতদুটো মুঠো করলাম। আমার মনে পড়ল, মহারাষ্ট্রীয় সেই ছোট ছেলেটির কথা। মহম্মদের বহিন না হয় আমারও বহিন হ'ল। সে না হয় এই ফুলগুলিকে ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশে ছুটতে ছুটতে এসে সেই দূরন্ত ছেলেটি আমার হাতে যে পুষ্পস্তবক উপহার দিল সে কিসের নিদর্শনে? মনে পড়ল, ব্যানার্জীর পরামর্শে তাকে একটি টাকা দিয়েছিলাম। তবে কি পয়সার লোভে? মনটা ভীষণ ছোট হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও খুব ছোট বলে মনে হ'ল। ছিঃ ছিঃ, এসব কি ভাবছি আমি। ওইটুকু শিশু লোভের কি বোঝে। তবে? অতটা পথ ঐ ভাবে ছুটে এসে কেন সে ফুলগুলো আমার হাতেই তুলে দিল? মন বলল, টানে। অন্তরের টানে। ভাললাগার টানে। ভালবাসার টানে।

রাস্তাটা বেশ ভীড় জমে আছে। উল্টোদিক থেকে একটা ট্যাক্সী এসে হর্ন বাজাচ্ছে। লোকগুলো দু-পাশে সরে আসতে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল।

আলিসাহেব তার দলবলকে দেখিয়ে আমাকে বলল, বাবুজী, আপনি যতদিন বোম্বাই-এ থাকবেন আমাদের মনে রাখবেন। আপনার কোন তকলিভ হ'লে একবার এই আলি সাহেবের নাম লিবেন। দেখবেন সারা বোম্বাই আপনার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

আমি মনে মনে বেশ খুশী হলাম। বুঝলাম, আলিসাহেবের মধ্যে সত্যিই কিছু না কিছু আছে। তার ভক্তের দলকে দেখে মনে

হ'ল এরা পারে না এমন কিছু কাজ বোধহয় পৃথিবীতে নেই।

ড্রাইভাররা অনেকেই দূর থেকে মহম্মদ আলির কাণ্ড দেখছিল। এরা বহুবার মহম্মদের সঙ্গী হয়ে কনভয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। এরা জানে, আলিসাহেব অরে পাঁচজন ড্রাইভারের মত সাধারণ নয়। ড্রাইভারী তার পেশা নয়। খানিকটা শখের মত। তারা কখনও মহম্মদকে কনভয়ের গাড়ী পাবার জন্য কারোর কাছে তোসামদ করতে দেখেনি। ইউনিয়নের নিয়ম অনুযায়ী তার পালা এলেই সে এসে হাজির হয়। তারপর কনভয়ের শেষে মহম্মদ যখনই বোম্বাই এসে পৌঁছেছে তখন প্রতিবার এমনি ভাবেই তার ভক্তের দল তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ড্রাইভারদের অভ্যস্ত চোখ তাই আমার মত অবাক হয়ে ওঠে না। তারা দূর থেকে আলিসাহেবকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর মনে মনে তার ভাগ্যের তারিফ করে। সখের ড্রাইভার আলিসাহেবের ভাগ্য সত্যই তারিফ করার মত। সে নামেই ড্রাইভার। ড্রাইভারীর নেশা যেমন তার সখ, এর থেকে প্রাপ্য রোজগারও তার কাছে তেমনি তুচ্ছ। তারা জানে ইচ্ছে করলে ঘরে বসে বসে আলিসাহেব এর হাজার গুণ টাকা বিনা আয়াসে উপায় করতে পারে। কিন্তু তবু মহম্মদ গাড়ী চালায়। কেন চালায় অনেকেই তা জানে না। তাদের কাছে আলিসাহেব খেয়ালী।

আমি নিজে মহম্মদকে একজন সাধারণ ড্রাইভার হিসেবেই ভেবেছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই সে আমার যত কাছাকাছি এসেছে তার সম্বন্ধে আমার ধারণাও তত দূরে চলে গেছে। এতক্ষণে মহম্মদ আলি ওরফে আলিসাহেব আমার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

বোম্বাই-এ আমার অবস্থান কালের ষোলআনা নিরাপত্তা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে আলিসাহেব তার সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে আমার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। সংকীর্ণ নির্জন গলিপথ অনেক মানুষের পদশব্দে মুখর হয়ে উঠল। আর আমার পরিপূর্ণ হৃদয় হঠাৎ যেন বেলুনের মত

চুপসে শূন্য হয়ে গেল। অনির্বচনীয় এক অনুভূতি আচমকা দেহ আর মনকে এমন ভাবে গ্রাস করল যে সেই মুহূর্তে আমার মনে হ'ল অব্যক্ত এক ব্যথা অত্যন্ত নির্মম ভাবে আমার পাকস্থলী থেকে মোচড় দিয়ে যেন কণ্ঠনালীতে এসে আটকে গেল।

ঠিক এইসময় ব্যানার্জী এসে সামনে দাঁড়াল। আমি খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ব্যানার্জী দু-বার ডাকার পর আমার ধ্যান ভাঙল।

ব্যানার্জী বলল, আপনাকে মিশ্রজী ভেতরে ডাকছেন।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর নিজের বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে ব্যানার্জীকে অনুসরণ করে আগরওয়ালা এ্যাণ্ড কোম্পানীর ব্রাঞ্চ অফিসের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

শিউশংকর মিশ্র হাত বাড়িয়ে দিলেন, আইয়ে দাসবাবু। মিষ্টার পালের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।

সুদর্শন পাল বয়সে বোধহয় আমার থেকে কিঞ্চিৎ ছোটই হবেন। কিন্তু তার লম্বা চওড়া চেহারা আর অদ্ভুত স্মার্টনেস তাকে যে পদের অধিকারী করে রেখেছে সেদিক থেকে আমার মত এ্যাকাউণ্টেণ্ট বাবুকে তার কাছে নিতান্তই ছোট করে দিয়েছে। বিশেষ করে তার সুন্দর মিষ্টি ব্যবহার আমাকে মুহূর্ত মধ্যে মুগ্ধ করে দিল। নিতান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বোম্বাই-এ আমার প্রিয়জনের ঠিকানা জেনে নিয়ে পালবাবু নিজের ব্রাঞ্চেরই একজন ড্রাইভারকে ডাকতে যাচ্ছিলেন। শিউশংকরবাবু বাধা দিলেন। ব্যানার্জীকে দেখিয়ে পালবাবুকে বললেন, আপনি একে পাঠিয়ে দিন। বোম্বাই-এর প্রতিটি গলি-ঘুঁজিও এর জানা আছে।

সুদর্শন পাল বললেন, তাই নাকি?

ব্যানার্জী হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলল, হ্যাঁ স্যার। আমি একরকম এখানকারই বাসিন্দা বলতে পারেন।

পালবাবু এক টুকরো কাগজে একটা গাড়ীর নাম্বার লিখে

ব্যানার্জীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ভালই হ'ল। তুমি দারোয়ানকে শ্লিপটা দেখিয়ে গাড়ীটা বার করে বাবুকে এখুনি পৌঁছে দাও।

ব্যানার্জী সঙ্গে সঙ্গে শ্লিপ নিয়ে অফিসের ভেতরের দরজা দিয়ে গ্যারেজের দিকে চলে গেল।

পনের মিনিটের মধ্যে সুদর্শন পাল আর মিশ্রজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আবার গাড়ীতে চড়ে বসলাম। ড্রাইভারের আসনে সেই ব্যানার্জী। পিছনের আসনে আমি। তবে এবার আমার গন্তব্যস্থল -জহুরী বাজার। আমার আত্মীয়ের বাড়ী।

পালবাবুর কাছে ব্যানার্জী যখন বলল যে সে বোম্বাইয়ের বাসিন্দা তখন থেকেই তাকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে নতুন করে আবার ভাবনা সুরু হ'ল। আশ্চর্য্যের ব্যাপার! আমি তো ভাবতেই পারি নি যে ব্যানার্জী কলকাতার বাসিন্দা নয়। কি করেই বা ভাববো। আমার সঙ্গে তার আজ প্রথম পরিচয় নয়। এর আগে কলকাতার অফিসে আমি তাকে একাধিক বার দেখেছি। তখন দু-একটা মামুলি কথা ছাড়া আর বেশী কিছুর প্রয়োজনই হয় নি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমি তাকে কলকাতাবাসী বলেই ধরে নিয়েছিলাম। তাছাড়া কলকাতা থেকে বোম্বাই আসার পথে যে কটি কথা ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার হয়েছে তার মধ্যে এসব কথা জানার কোন সুযোগই আমি পাই নি। অথচ এখন শুনলাম ব্যনার্জী বোম্বাইয়ের বাসিন্দা। তাই বেশ অবাক হয়ে গেলাম।

গাড়ী মহারাষ্ট্রের রাজপথে ছুটে চলেছে। আমি এই প্রথম বোম্বাই-এ এলাম। মনের মধ্যে শহর দেখার প্রবল ইচ্ছা। তবু তার চেয়েও অদম্য কৌতূহল ব্যানার্জীকে জানার। কিন্তু এখন আমি নিজেকেই নিজে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এত লোকের সঙ্গে মিশলাম। কত কথা হ'ল। কিন্তু ব্যানার্জীকে সবচেয়ে বেশী সময় একেবারে কাছে পেয়েও তার কিছুই জানা হ'ল না। আমার কাছে

ব্যানার্জী কেমন দুর্বোধ্য। মনের মধ্যে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারছি না। কেন পারছি না তাও জানি না। কেমন যেন একটা বাধো বাধো ঠেকছে। যেন মনে হচ্ছে এ আমার অনধিকার চর্চা। ব্যানার্জী নিজেও আগাগোড়াই কেমন চুপচাপ। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া খুব কম কথা বলে সে। আমার প্রতি তার যেন কোন কৌতূহলই নেই। সে শুধু গাড়ী চালায় আর হল্ট করে। হল্ট করে আর গাড়ী চালায়। মহম্মদ আলির মত সে আগবাড়িয়ে নিজের ইতিহাস বলে না। উইলশনের মত তার বাড়ীতে বেড়াতে যাবার অনুরোধ করে না। মুক্তি ঝা-র মত নিজের আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দেয় না। ব্যানার্জীর প্রতি আমার আগ্রহ তাই সবার চেয়ে বেশী। সে আমার সবচেয়ে কাছে থেকেও সকলের চেয়ে দূরে সরে রইল। আমি তাকে জানলাম না, চিনলাম না। তার জীবনের ইতিহাসের মলাট উল্টে ভেতরের পাতাগুলো চোখ বোলাবার কোন সুযোগ পেলাম না।

আগরওয়ালা এণ্ড কোম্পানীর ব্রাঞ্চ অফিস থেকে আমার বোম্বাই পৌঁছানোর খবর আমি আমার আত্মীয়কে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলাম। মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে ব্যানার্জীর গাড়ী আমার আত্মীয়ের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে গেল।

দরজা খুলে ওরা আকুল আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই হুড়মুড় করে গাড়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন।

ব্যানার্জী তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে ঘুরে এসে পেছনের দরজা খুলে দাঁড়াল।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে গাড়ী থেকে নেমেই ব্যানার্জীর চোখে চোখ রাখলাম।

ছোট সাইজের চোখ দুটোর দৃষ্টি করুণ লাগছিল। আমি কিছু বলার আগেই ব্যানার্জী পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে অত্যন্ত বিনীত ভাবে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার

বড় ইচ্ছে ছিল অন্য সকলের মত আমিও আপনার সঙ্গে আমার আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় করিয়ে দিই। কিন্তু পারলাম না। আমি জানি, আপনি হয়ত আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে নরককুণ্ডে আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না। কেন পারব না—তাও আমি আপনাকে বলতে পারছি না। এই কাগজটায় আমার ঠিকানা লেখা আছে। যদি কখনও আমার মত অভাগাকে মনে পড়ে তবে দয়া করে একবার পায়ের ধূলো দেবেন।

কথাটা বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ব্যানার্জী গাড়ী নিয়ে রাজপথে মিশে গেল। হাজারো গাড়ীর ভীড়ে চোখের পলকে তার গাড়ী কোথায় হারিয়ে গেল।

ঠিক পাঁচদিন হ'ল বোম্বাই-এ আমি আমার আত্মীয়ের বাড়ী এসে উঠেছি। কিন্তু বোম্বাই দেখার সৌভাগ্য আমার এখনও হয় নি। সারাইপালি থেকে রায়পুর আসার পথে যে বর্ষার সূচনা হয়েছিল বোম্বাই-এ বুঝি তার সমাপ্তি হ'তে চলেছে। আমি হাওড়ার ছেলে। প্রতি বছর বর্ষার জলে ডুবন্ত হাওড়ার অলিতে-গলিতে কত বাচ্চাকে সাঁতার শিখতে দেখেছি। ঝাঁকামুটের মাথায় চেপে কত অফিসবাবুকে অফিস যেতে দেখেছি। কিন্তু মহারাষ্ট্রের বর্ষা বুঝি বাংলার বর্ষাকেও লজ্জা দেয়। পাঁচ-পাঁচটা দিন আমি পাঁচতলা বাড়ীর পশ্চিমের জানালায় বসে বসে বৃষ্টির ফোঁটা গুণছি আর দফায় দফায় পরমাত্মীয়ের হাতের রকমারি রান্নার স্বাদ গ্রহণ করছি। এমনি ভাবেই হয়ত বাকি দিনগুলিও কাটতো। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে ঝড় এসে সব তাল-

গোল পাকিয়ে দিল। বোম্বাই-এর আকাশ থেকে মেঘের দলকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে সে তাদের বোম্বাই-এর সীমানার বাইরে রেখে এল। এমনি এক বিকেলে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে উঁকি মারতে দেখে আর ঘরে থাকতে মন চাইল না। সেদিনই সন্ধ্যায় আত্মীয়কে সঙ্গে করে বোম্বাই দেখতে বেরোলাম।

পর পর চারদিন কেটে গেল। ছোট শহর বোম্বাই ঘুরে বেড়াতে চার দিনই যথেষ্ট। আমার ছুটি ফুরিয়ে এল। আজ নিয়ে ন'দিন বোম্বাই-এ এসেছি। পথে আসতে সময় লেগেছে ছ'দিন। মোট পনের দিন। হাতে আছে মাত্র চার দিন। এর মধ্যে ট্রেনপথে কলকাতা ফিরতে সময় লাগবে প্রায় পুরো দু-দিন। অতএব আর নয়। এবার ঘরে ফেরার জন্য তৈরী হতে হবে। কিন্তু সময় যত ফুরিয়ে আসে মন ততই বেঁকে বসে। ততই অনুরোধ, অনুনয়, বিনয়, আর হাজারো প্রশ্ন— আর কটাদিন থেকে গেলে কি হ'ত? কিসের অত কাজের তাড়া? একবার গেলে কি আর মনে পড়বে?

করুণ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মন। চোখ ছলছল করে। যে ছিল না তাকে হঠাৎ পেয়ে আবার হারানোর ব্যথা বেশী করে বাজে। আসন্ন বিচ্ছেদে মন বিমনা হয়। কোথায় ভেসে বেড়ায়। ডাকলে সাড়া নেই। পেটে ক্ষিদে অথচ খাবারে রুচি নেই।

হায় মন! তোমার কাঙালপনা গেল না। তুমি যত পাও তত চাও। এই চাওয়া-পাওয়ার বাইরে এলেই তুমি শূন্য। আর শূন্য হলেই হাহাকার! এই হাহাকারে ভরে আছে পৃথিবী। এই পৃথিবীতে তুমি তোমার বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াও। তোমার চাওয়াতেও ব্যথা আর পাওয়াতেও ব্যথা। তবে আর আনন্দ কোথায়?

আনন্দ আছে। ঐ ব্যথাই তোমার আনন্দ। অজস্র আনন্দ নিঙড়ে তুমি যে ব্যথার নির্যাস তৈরী কর সেই তো তোমার আনন্দের জন্ম দেয়। তুমি ভুল করে কেঁদে মরো। ভাবো বুঝি সব গেল। কিন্তু যায় না কিছুই। সব আছে। সব থাকে।

মন বলে, আছে নাকি ? সব আছে ? তবে আর ঘরে কেন বসে থাকি। যাই খুঁজে বেড়াই।

সাদা কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে একা একাই ঠিকানা খুঁজে বেড়াই। এগারো—বারো—পনের—সতেরো—একি! এর পর এ কি গলি! সারি সারি ঘর। ঘরে ঘরে জানালা। জানালায় জানালায় পর্দা। আর পর্দার সামনে-আড়ালে এ কাদের উঁকি-ঝুঁকি। বুক কেঁপে ওঠে। ভয় হয়। কেউ দেখছে না তো ? মনে মনে ভাবি ভুল হল নাকি। ঠিকানা মেলাই। না। ঠিক আছে। আঠারোর তিন দিয়ে বাড়ীর স্নুরু। উনিশের তু-এর তফাতে গিয়ে দাঁড়াই।

বোম্বাই-এর বাতাসে নাতিশীতোষ্ণের ছোঁয়া। তবু ঘেমে উঠি। ঘরে ঘরে লাল-নীল আলো জ্বেলে জোনাকীর মত ওই যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা কি ব্যানার্জীর আত্মীয় ?

ভেবে কূল-কিনারা পাই না। এ কোথায় এলাম !

হঠাৎ পেছন থেকে কার গলা পেয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠি।

ব্যানার্জী লজ্জা পায়। অপরাধীর মত ভীরু চোখ তুটোর দৃষ্টি সোজা আমার ওপর ফেলতে পারে না।

আমার ধড়ে প্রাণ আসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যানার্জীর দ্বিগুণ লজ্জায় লাল হয়ে উঠি। কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। ব্যানার্জীকে কোন কথা বলার স্নুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি লজ্জা গোপন করতে মিথ্যে বলি, আর বল কেন। ভালো হিন্দি বুঝি না তো। একজনকে ঠিকানা দেখাতে সে এই রাস্তাটাই দেখিয়ে দিল বলে মনে হ'ল। অথচ এখন বুঝতে পারছি ভুল হয়েছে।

ব্যানার্জী মাথা নিচু করে রাস্তার দিকে নজর রেখে বলল, না

বাবু। ভুল হয় নি। আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।

আমার সব গুলিয়ে গেল।

একটা তে-মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। জায়গাটা লোকজন গিসগিস করছে। তারই মধ্যে গাড়ীর শব্দ, ফেরিওয়ালার চিৎকার, ফুলের বাজার।

এবার চুপচাপ। কারোর মুখেই কোন কথা নেই। দুজনের মনেই লজ্জা। আমার মিথ্যে বলার লজ্জা। ব্যানার্জীর সত্যি বলার লজ্জা। দুই লজ্জায় মিলেমিশে একাকার।

ব্যানার্জী লজ্জার মাথা খেয়ে এগিয়ে গিয়ে আমাকে ডাকে।

আমি অন্ধের মত ওকে অনুসরণ করি।

উনিশের দুই বাড়ীর মুখেই ডান দিকে ছোট ঘর সবুজ আলোয় ভাসছে। দরজায় হালকা পর্দাব ফাঁক দিয়ে সমবেত হাসির খিল খিল আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ঘর পেরিয়েই একটা দালানের মত খানিকটা অংশে কিছু ভাঙাচোরা আসবাব পত্র এলোপাতাড়ি ছড়ানো। দালান পার হতেই অনেকটা লম্বা সরু উঠানের পূব দিক ঘেঁষে পর পর ঘরের সারি। ঘরের দরজায় দরজায় পর্দা। কোন কোন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে রঙ-বেরঙের আলো বাইরে এসে উঠোনটায় আবছা আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। সেই আলোছায়ার ভেতর দিয়ে মাথা হেঁট করে হেঁটে যাচ্ছে ড্রাইভার সন্তোষ ব্যানার্জী। পেছনে পেছনে আমি।

তিন...চার...পাঁচ···ছয়। উঠোনের পূব দিকে বাঁক নিতেই উত্তরমুখো শেষ ঘরখানির সামনে গিয়ে ব্যানার্জী থমকে দাঁড়াল। সামান্য তফাতে আমি--বোবার মত নিশ্চুপ।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পাশেই ছোট্ট জানালা। ব্যানার্জী জানালার পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই কার গলা শোনা গেল। ব্যানার্জী আমার দিকে পেছন ফিরে একবার তাকাল। মনে হ'ল খুবই অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে সে। জানালা থেকে সরে এসে দরজায়

আওয়াজ করতেই একজন মহিলা দরজা খুলে দিয়েই সামনে আমাকে দেখে সরে দাঁড়াল।

আমি ব্যানার্জীর দিকে তাকালাম।

ব্যানার্জী মহিলার দিকে তাকাল।

মহিলাটির বয়স হয়েছে। আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে। চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ভাব।

ব্যানার্জী বোধহয় চোখ দিয়ে কিছু ইশারা করল।

মহিলাটি দরজা ছেড়ে আরও একটু সরে দাঁড়াল।

আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে দেখে ওরা দুজনেই অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে। কিন্তু আমার অবস্থা আরও শোচনীয়। এমন পরিবেশে আর কখনও পড়ি নি। আশপাশের মানুষগুলোর পরিচয় আমার কাছে এখন জলের মত পরিষ্কার। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি কেন ব্যানার্জী সেদিন নিজের বাড়ীতে আমায় নিয়ে আসতে অত কুণ্ঠা বোধ করেছিল। সে বলেছিল, এ নরককুণ্ডে সে নিজে আমাকে নিয়ে আসতে পারবে না। আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল। নিজের ওপর ধিক্কার লাগল। দিন দিন বুদ্ধি-সুদ্ধি আমার লোপ পেয়ে যাচ্ছে যেন। অহেতুক কৌতূহল এমনি ভাবে আমায় বিপাকে ফেলেছে। আমার এখন কিছুই করার নেই। পর্দা ফেলা ঘরগুলোর আবছা প্রতিচ্ছবি আমার অনভ্যস্ত চোখ দুটোকে সঙ্কোচে ভরিয়ে দিয়েছে।

মহিলাটি দরজার পাশে সরে দাঁড়াতে ব্যানার্জীর নির্দেশ মত আমি ওর পিছু পিছু ঘরে ঢুকলাম। দরজা আবার আগের মত বন্ধ হয়ে গেল।

মহিলাটির মুখোমুখি হলাম। আটপৌরে তাঁতের শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ানো। মুখের চামড়ায় মাঝে মাঝে কোঁচ ধরেছে। চোখের ঘোলাটে মণি দুটোয় কেমন যেন সন্দেহের ছায়া।

ব্যানার্জী পরিচয় করিয়ে দিল, আমার দিদি, ছবি চ্যাটার্জী।

ছবি চ্যাটার্জী আমার দিকে তাকিয়েই ছিল। এবার হাসতে যেতেই পানের ছোপ লাগানো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে ব্যানার্জীর দিদিকে আমি চেষ্টা করেও অন্যভাবে নিতে পারলাম না। আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগল। মনে হ'ল, ছবি চ্যাটার্জীর পরিচয় নতুন করে জানার আর প্রয়োজন নেই। এ বাড়ীর পর্দার আড়ালে আড়ালে যে রহস্য, বিচিত্র বর্ণের আলোছায়ার যে লুকোচুরি, সমবেত নারীকণ্ঠের হাসির যে নির্লজ্জতা, অবিন্যস্ত বেশ-ভূষার যে ইচ্ছাকৃত শিথিলতা—তাতে ক'রে নিতান্ত নির্বোধেরও বুঝতে বাকি থাকে না যে এরা কারা।

তবু ব্যানার্জীর পরিচয়ের পালা শেষ হ'ল। কিন্তু আমাদের দু-পক্ষের কেহই তেমন রীতিগত নমস্কারের ধার ধারলাম না।

ব্যানার্জীর দিদি অকারণেই কোমরের আঁচল খুলে আবার কোমরেই জড়াতে জড়াতে বলল, সন্তোষ আপনার কথা বলেছিল। কি ভাগ্যি! আপনার মত মানুষের পায়ের ধূলো পড়ল।

কথাগুলো ঠিক শেখানো বুলির মত লাগল। যেন এমনিই কথা ছিল। আমি হঠাৎ এসে পড়ব। ব্যানার্জী রাস্তা দেখিয়ে বাড়ীতে এনে পরিচয় করিয়ে দেবে। আর ছবি চ্যাটার্জী নিজের ভাগ্যের তারিফ করে আমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ধন্য হবে।

আমার কোন উত্তর দেবার নেই তাই চুপ করেই রইলাম। এই পরিবেশে ব্যানার্জীকে একেবারে অচেনা লাগছে। কনভয়ের ড্রাইভার সন্তোষ ব্যানার্জীকে এ বাড়ীতে ঢোকার আগে যেন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। এখন যে আছে সে অন্য মানুষ। এখানে তার অন্য পরিচয়। আজ থেকে ন'বছর আগে উনিশশো আটষট্টি সালের অক্টোবরে এই নতুন পরিচয় নিয়ে নতুন করে জন্মেছে সন্তোষ ব্যানার্জী। উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরের আঠাশ বছরের যুবক সন্তোষ সেদিনও কি ভাবতে পেরেছিল যে আটষট্টি সালের এক প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় তার জীবনকে এমনি ভাবে তছনছ করে দেবে।

আমাকে বিছানায় বসিয়ে রেখে বড়দিদির সঙ্গে ব্যানার্জী ভেতরের ঘরে গেল। আমি নিজের অবাধ্য চোখ দুটোকে নিয়ে ভারী মুশকিলে পড়লাম। ব্যানার্জীকে আজ ক'দিন ধরে দেখে দেখে তার সম্বন্ধে যে মনগড়া ধারণা করেছিলাম এখন সে ধারণায় যতই চিড় খাচ্ছে অবাধ্য চোখদুটো আমার শাসনকে অগ্রাহ্য করে তার কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে ততই যেন ঘরময় চেখে চেখে বেড়াচ্ছে। ছোট বিছানা। দুজন মানুষ কোন রকমে গায়ে গা ঠেকিয়ে শুতে পারে। একটা সস্তা কাঠের সেকেলে দেরাজের মাথায় ট্রানজেস্টার রেডিও সেট। এককোণে আলনা। তার পাশে ছোট মিটকেসের ওপর আয়না, চিরুনি, কিছু প্রসাধনী দ্রব্য। কিছু এ্যালাপাথি মিক্সচারের শিশি, দুটো পুরানো সিনেমা পত্রিকা, একটা চিনে মাটির ফুলদানিতে কিছু শুকনো রজনীগন্ধার ডাঁটা।

এঘর এখন নিস্তব্ধ। সাধারণ গেরস্থ ঘরে বাইরের অতিথি এলে সচরাচর বাড়ীর সকলেই সতর্ক হয়ে উঠলে যেমন থমথমে আব-হাওয়ার সৃষ্টি হয়। এ ঘরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে পাশাপাশি সারিবদ্ধ অন্য ঘর থেকে হাসি গান আর বিচিত্র সংলাপের টুকরো টুকরো আওয়াজ ভেসে আসছে।

আমি বসে বসে এলোপাতাড়ি ভাবছি। ছবি চ্যাটার্জী ফিরে এল। হাতে এককাপ চা আর দুখানা বিস্কুট।

আমার চা-এর নেশা নেই। তবু দু-বেলা দু-কাপ চা খাই। এ বেলার চা সন্ধ্যের আগে খেয়ে বেরিয়েছি। এখন রাত আটটা। চা খাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তবু ছবি চ্যাটার্জী চায়ের কাপ বিছানায় রেখে বলল, আপনি আমাদের ওপর নিশ্চয়ই রাগ করে আছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ বাড়ীতে নিজের ইচ্ছেয় আমরা আসি নি।

আমি ছবি চ্যাটার্জীর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। মাথা হেঁট করে একরাশ লজ্জার মধ্যে ভাসতে ভাসতে চায়ের কাপটাই

হাতে তুলে নিলাম।

ব্যানার্জীর দিদি বলে চলল, সন্তোষের বউ-এর শক্ত অসুখ। আজ তিন বছর ভুগছে। বাঁচবে না জানি। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এ বাড়ীতে ফেলে রাখতেও পারছি না আবার নাড়াচাড়া করতেও ভয় লাগছে। ডাক্তার যে বলেছে, সামান্য নাড়াচাড়াতেও ক্ষতি হ'তে পারে। কি করি বলুন। তাই এই আস্তাকুঁড়ে পড়ে আছি।

আমার কোন উত্তর নেই। এখন শুধু শোনবার পালা। আমার কৌতূহলী মনের চা-এর কাপে নজর নেই। সে উৎকর্ণ হয়ে ছবি চ্যাটার্জীর গল্প শুনছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর যখন বাংলাদেশ ভাগাভাগি হ'ল তখন পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী হয়ে সন্তোষ ব্যানার্জী তার বিধবা দিদির সঙ্গে জলপাইগুড়িতে চলে আসে। মা-বাবা আর একটা ছোট ভাইও ছিল তার। আটচল্লিশের দাঙ্গায় তারা মারা পড়ে। দিদির সঙ্গে সন্তোষ কোনরকমে জলপাইগুড়িতে পালিয়ে এসে প্রাণে বাঁচে।

ছবি চ্যাটার্জী বালবিধবা। তের বছর বয়সে প্রাইমারী স্কুলে পড়তে পড়তে কেষ্ট চাটুজ্যের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কেষ্ট জুটমিলে তাঁত চালাত। বিয়ের ছ-মাস পর এক রোববার সকালে নতুন বউএর শাড়ী কিনে বাড়ী ফেরার পথে আচমকা বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হ'ল।

ছবি চ্যাটার্জী বিধবা হ'ল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতে সে একবারই গেছে। সেই নতুন বউ হয়ে। তারপর ধূলোপায়ে বাপের

বাড়ী এসে আর যায় নি। কেষ্ট, মিলের হপ্তা পেয়ে ফি রোববার বিকেলে শ্বশুর বাড়ী আসত। তারপর রাতটুকু কাটিয়ে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে ছুটায় গিয়ে মিলে জয়েন দিত।

বিধবা হয়ে ছবি চ্যাটার্জী আর শ্বশুর বাড়ী গেল না। কেষ্টর মা-বাবা বিধবা বউকে ঘরে নিতে আপত্তি করে নি। কিন্তু যদু বাড়ুজ্যে পাঠাল না। একটা মেয়ে তার। বিধবা হয়ে শ্বশুর-বাড়ীতে হয়ত সারাজীবন গঞ্জনা সইতে হবে। তার চেয়ে বাপের বাড়ীই ভালো। যদু বাড়ুজ্যে তবু চোখের সামনে তাকে দু-বেলা দেখতে পাবে। সে ভাববে তার মেয়ের বিয়ে হয় নি।

তের বছরের ছবি কিন্তু বাবার মত ভাবতে পারল না যে তার বিয়ে হয় নি। বিধবা হয়ে সে আবার স্কুলে ভর্তি হ'ল। কিন্তু সে বুঝতে পারল সকলের থেকে সে ক্রমশঃ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ঘরে বাইরে কিশোরী এই মেয়েটিকে সকলেই এত বেশী করুণার চোখে দেখতে সুরু করল যে ছবি চ্যাটার্জী অনায়াসে ধরে নিল যে ভবিষ্যতে তাকে আর বিয়ের জন্য ভাবতে হবে না। কথাটা ভেবে মনে মনে সে নিশ্চিন্ত হ'ল।

পনেরোয় পা দিয়েই ছবি চাটার্জী তাই একটু বে-পরোয়া হয়ে উঠল। ফ্রক ছেড়ে সে অনেক, আগেই শাড়ী ধরেছে। এবার সে আরও একধাপ এগুলো। পূর্ব বাংলার সতেজ শ্যামল গাছপালার মত তার দেহের লাবণ্য ফেটে পড়তে লাগল। তার দেহের গড়ন বয়সের হিসেবকে ছাড়িয়ে গেল।

এমন সময় সুরু হ'ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রচিত হ'ল একই মাতৃভূমির দুই ভাইয়ের পরস্পর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নব ইতিহাস। হারিয়ে গেল দেশ, হারিয়ে গেল সমাজ, হারিয়ে গেল আইন, শৃঙ্খলা, প্রেম, ভালবাসা, দয়া, মায়া সব কিছু। এরই সঙ্গে শত শত মানুষের মতো হারিয়ে গেল ছবির মা বাবা আর ছোট ভাই।

এক অন্ধকার নিশিথে আট বছরের ভাই সন্তোষের হাত ধরে

ছবি এসে জুটে গেল আরও অনেকের সঙ্গে। তারপর শরণার্থী হয়ে প্রবেশ করল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে।

ক্রমে দাঙ্গা থেমে গেল। যুবতী বোন কচি ভাইকে নিয়ে শরণার্থী হয়ে এ গ্রামে সে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষে হাজির হ'ল জলপাইগুড়ি শহরে। আশ্রয় মিলল চা বাগানের এক ম্যানে-জারের বাড়ীতে। দু-ভাইবোনের থাকা খাওয়া আর দশ টাকা হাতখরচ। পরিবর্তে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম। তাই সই। তবু তো আশ্রয়। খেয়ে পরে বেঁচে থাকা যাবে।

চা বাগানের ম্যানেজরের বউ ছিল লেখিকা। কলকাতার কাগজে তার গল্প বেরুত। কয়েকখানা বই-ও বেরিয়েছে। তার কাছে ছবি পেল নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু এদিকে শহর তখন অনাচারে ছেয়ে গেল। শরণার্থীদের ঘরে ঘরে পাপ ঢুকল। মদ, মেয়েছেলে, ব্ল্যাকমার্কেট, চোরা-চালান আর জাল-জোচ্চুরিতে শহর ভরে গেল।

ছবি চ্যাটার্জীর লেখিকা গৃহকর্ত্রী বুঝল, সোমত্ত মেয়ে ছবিকে বোধহয় আর নিরাপদে রাখা সম্ভব হবে না। তাই স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে বোম্বাই-এর এক চা-ব্যবসায়ীর সঙ্গে ছবির বিয়ে দিয়ে দিল।

নতুন স্বামীর সঙ্গে নতুন বউ হয়ে ছবি বোম্বাই চলে গেল।

সময় পেরিয়ে যায়। কিশোর বালক সন্তোষের মনে কষ্ট হয়। দিদিকে বড্ড বেশী করে মনে পড়ে। অগত্যা একদিন কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি সে কলকাতায় পালিয়ে আসে।

কলকাতায় আসার পথে ট্রেনে নন্দলালের সঙ্গে আলাপ হয় সন্তোষের। কনভয় ড্রাইভার নন্দলাল শিলিগুড়িতে গাড়ী ডেলিভারী দিয়ে কলকাতায় ফিরছিল। সন্তোষের কাছ থেকে তার খবর শুনে নন্দলাল তাকে নিজের বাসার ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলল।

ভবানীপুরে নন্দলালের বাসায় দেখা করতে সন্তোষের মোটামুটি একটা হিল্লে হয়ে গেল। নন্দলাল তাকে নিজের কাছে রেখে সময়ে অসময়ে একটু আধটু ট্রেনিং দিতে লাগল। সন্তোষ ছিল একগুঁয়ে। ড্রাইভিং-এ তার জেদ চেপে গেল। যেমন করেই হোক গাড়ী চালানোটা শিখতেই হবে। নন্দলালেরও চেষ্টার ত্রুটি নেই। কনভয়ের ফাঁকে ফাঁকে এক বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের গাড়ী চালাত সে। সন্তোষ সেই গাড়ীর সঙ্গে আঠার মত লেগে রইল। নন্দলালের চ্যালা হয়ে গাড়ী রক্ষণা-বেক্ষণের ভার সে নিজের হাতে তুলে নিল। বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার নিশ্চিন্ত হ'ল। সেই সঙ্গে খুশীও। আর খুশী হলেই তার খেসারৎ দিতে হয়। সন্তোষও খেসারৎ পেলো। গাড়ীর চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী হয়ে খুব তাড়াতাড়ি সে তার জেদ বজায় রাখল। সত্যি সত্যিই সে একজন পাকা ড্রাইভার হ'য়ে উঠল।

কিন্তু কলকাতাতে তার মন টেকে না। জলপাইগুড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, চা বাগানের ঢেউ খেলানো সবুজ প্রান্তর, তিস্তার বিস্তীর্ণ বালুচর—তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে। সন্তোষের মন আনচান করে ওঠে।

নন্দলাল বুঝতে পারে। তার মনে পড়ে মজঃফরপুরে ফেলে আসা কৈশোরের স্বপ্নময় দিনগুলোর কথা। তাই একদিন সন্তোষের হাত ধরে সে গিয়ে হাজির হ'ল বাজোরিয়া সাহেবের কাছে।

সবেমাত্র কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দিয়েছে সন্তোষ। তার গোঁফের রেখা তখনও পুরোপুরি স্পষ্ট হয় নি। এই বয়সের ছেলেকে কনভয়ের গাড়ী চালানোর দায়িত্ব দেওয়া উচিত হবে কিনা বাজোরিয়া তার ঘোলাটে চোখদুটো দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্তোষের দিকে তাকিয়ে

সেই কথাই বোধহয় ভাবতে যাচ্ছিল। কিন্তু স্বয়ং নন্দলাল যার সহায় কনভয়ের দায়িত্ব তার হাতের মুঠোয়—কথাটা নন্দলালই রামকিশন বাজোরিয়াকে জানিয়ে দিল। অতএব দেখাই যাক একবার দায়িত্ব দিয়ে।

পরের মাসেই পাঁচজনের একটা ছোট গ্রুপে প্রথম চান্স পেল সন্তোষ ব্যানার্জী। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি। দূরত্ব ছ'শো একান্ন কিলোমিটার।

সন্তোষ সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'ল। কোন অসুবিধেই হ'ল না তার। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে পরম নির্বিঘ্নে জীবনের প্রথম দায়িত্বের ষোল আনা পালন ক'রে শিলিগুড়িতে এসে পৌছোল সে।

কিন্তু শিলিগুড়িতে এসেই তার মন পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে গেল। এখান থেকে জলপাইগুড়ির দুরত্ব আর কতটুকু। তার মনে পড়ল, ময়নাগুড়ি গ্রামের কথা। মনে পড়ল, চা-বাগানের ম্যানেজারবাবু আর তার লেখিকা বউ-এর কথা। মনে পড়ল, তার দিদির কথা। চোখছুটো ভিজে ওঠে সন্তোষের। সেই সঙ্গে অনেক স্মৃতি, অনেক ব্যথা। সেই ঝাউবন, সেই শালগাছ, সেই খাঁজকাটা পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাজানো চা বাগিচার ফ্রেমের মধ্যে দিদির হাত ধরে তার ঘুরে বেড়ানোর ছবি।

ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে বুক। কিন্তু জলপাইগুড়ি ছেড়ে যেতে সন্তোষের পা ওঠে না। মনে আশা জাগে, হয়তো দিদি কোনদিন ফিরে আসবে। হয়তো চা-বাগানের বন্ধুর পথে আবার তার মুছে যাওয়া পায়ের দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, হয়তো ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে সূর্যের পরিক্রমণের সাথে সাথে তার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠবে। ক্রমে জলপাইগুড়িতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামবে। আর সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পেছনে থেকে কে যেন আচমকা তার চোখছুটো টিপে ধরবে। সন্তোষ বিন্দুমাত্র অবাক হবে না। একটুও ভয় পাবে না। তার একান্ত পরিচিত হাতের

স্পর্শে খুশি খুশি মন নিয়ে ইচ্ছে করেই সে এক এক করে অজানা অচেনা লোকের নাম করে যাবে।

খুশিতে ফেটে পড়বে ছবি চ্যাটার্জী। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে একসময় খিল খিল করে হেসে উঠবে সে। অন্ধকার বনাঞ্চলে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে তার হাসি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসবে।

গাড়ী ডেলিভারী দিয়ে নন্দলাল কলকাতায় ফিরে গেল। সন্তোষ জলপাইগুড়িতেই রয়ে যায়।

অল্পদিনের মধ্যেই একজন বিল্ডিং কণ্ট্রাকটরের প্রাইভেট গাড়ী চালাবার চাকরী পেল সন্তোষ। এইসময় একটা ঘটনা ঘটল।

জলপাইগুড়ির এক বস্তি অঞ্চলে বাস করত সুরেন সাহা। সে ছিল শহরের প্রসিদ্ধ এক উকিলের মোক্তার। স্ত্রী আর এক মেয়ে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। মোক্তার হিসাবে সারা শহরে তার যতটা নামডাক ছিল অর্থের দিক থেকে ঠিক ততটাই ছিল অভাব। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়তে পড়তে কোন্ মাষ্টারমশাই তাকে সত্যবাদী হবার মন্ত্র শিখিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে সুরেন সাহা জীবনে একটিও মিথ্যে বলে নি। সততার দিক থেকে আইন আর আদালতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে তার জুড়ি মেলা ভার। ফলে তিন মানুষের সংসারে সত্য আঁকড়ে পড়ে থাকার যে ফল সুরেন সাহাকে চিরটাকাল তা ভোগ করতে হয়েছে। অভাব আর অনটন সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে।

এই সুরেন সাহার মেয়ের নাম টুনটুনি। বস্তির সকলেই তাকে

টুনি বলেই ডাকে।

সেবার বৈশাখ মাসের শেষলগ্নে সুরেন সাহা তার মেয়ের বিয়ের ঠিক করল। পাত্র এক চা-বাগানের এ্যাকাউন্টেন্ট। পাত্রের বাবার বন্ধকী কারবার ছিল। পাঁচজনের জিনিষপত্র বন্ধক রেখে টাকা ধার দিত সে। সুরেন সাহার সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছিল বিয়েতে দু-হাজার টাকা বরপণ চাই তার। কিন্তু বিয়ের রাতে হঠাৎ চুক্তিভঙ্গ করে সে দাবি করল তিন হাজার টাকা। সুরেন সাহা অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। জীবনে যে কোনদিন একটিও মিথ্যে বলে নি বিয়ে বাড়ীর নিমন্ত্রিতদেব মধ্যে তার সততায় সকলেরই সন্দেহ জাগল। সুরেন সাহার আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। এতবড় অপমান হজম করার মত শিক্ষা সে পায় নি। সেই রাতেই সে বিয়ে ভেঙে দিল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। মাত্র এক হাজার টাকার জন্যে মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেওয়াতে সকলেই সুরেন সাহার বুদ্ধির নিন্দা করলেও ফুটফুটে টুনির ভবিষ্যৎ চিন্তায় চিন্তিত হয়ে উঠল। তখন পাড়ার ছেলেরা ঘুমন্ত সন্তোষকে বিছানা থেকে তুলে এনে বরের পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। সেই রাতেই সন্তোষ ব্যানার্জীর সঙ্গে নটুনি সাহার বিয়ে হ'য়ে গেল।

এমন বাধ্য হয়ে বিয়ে করার ইতিহাস নতুন নয়। একদিন সন্তোষও পুরোণো হ'য়ে গেল। এতদিন তার কেউ ছিল না। এখন টুনটুনি এল। সে তার স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতায় বস্তির সবাইকে অস্থির করে তুলল। অভাব আর অনটনের মধ্যে বাস করে বস্তির মানুষগুলো এতদিন হাসতে ভুলে গিয়েছিল। টুনটুনি এসে আবার তাদের মুখে হাসি ফোটাল।

এমন সময় ঘটল এক চরম বিপর্যয়।

সেটা উনিশ শো আটষট্টি সালের অক্টোবর মাস। সারা বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ জুড়ে সুরু হয়েছে শারদীয়া দুর্গোৎসব। হঠাৎ জলভরা কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। সুরু হ'ল বৃষ্টিপাত।

তিনদিন তিনরাত একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হ'য়ে গেল সারা জলপাইগুড়ি শহর। তবু তারই মধ্যে কোন রকমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখার চেষ্টা চলছিল। শুধুমাত্র বস্তি অঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলো অসহায় হ'য়ে হাঁটু জল ভেঙে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছিল।

এমন সময় গর্জে উঠল তিস্তা। হিমালয় দুহিতা তিস্তা গভীর রাতে রাক্ষুসী মূর্তি ধরে কূলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটানা বৃষ্টির ফলে নিদারুণ জলস্ফীতিতে পাহাড়ের সমান ঢেউ তুলে মুহূর্ত-মধ্যে সে প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটাল। ঘুমন্ত জলপাইগুড়ি শহরকে গ্রাস করে উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠল সে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল সন্তোষের। কিসের একটা শব্দে ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে যেতেই আচমকা একগলা জলে পড়ে গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। চারিদিক হাতড়ে-হাতড়েও টুনটুনিকে দেখতে পেল না। শুধু জল আর জল। কনকনে ঠাণ্ডা জল। সব গোলমাল হয়ে গেল তার। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে টুনটুনিকে ডাকতে ডাকতে এগোতে গিয়ে প্রবল জলস্রোতে অসহায়ের মত ভেসে চলল সে।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এল মনে নেই সন্তোষের। চোখ মেলেই সে দেখল সকাল হয়েছে। একটা দোতলা বাড়ির ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। উঠে বসতে যেতেই সারা শরীরে অসম্ভব ব্যথা অনুভব করল।

তবু মাথা তুলে চারিদিকে তাকাতে চোখে পড়ল তারই মত আরও অনেক মানুষ।

এবার ধীরে ধীরে সন্তোষ বুঝতে পারল তিস্তার বন্যার জলে তারই মত ভাসতে ভাসতে এই শিবিরে সবাই আশ্রয় পেয়েছে।

দুটি সমবয়সী ছেলে এসে সামান্য গরম দুধ খেতে দিল সন্তোষকে।

সন্তোষের গলা বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তার ওপর ঠাণ্ডায় শরীরের মধ্যে একটা কাঁপুনি। সামান্য দুধেও শরীরে যেন বেশ কিছুটা বল ফিরে পেয়ে উঠে বসল সে। নিচের দিকে চোখ পড়ল। অথৈ সমুদ্রের অশান্ত রূপ। সারা শহর জলে ভাসছে।

এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুক। এত মানুষের মধ্যে টুনটুনিকে তো কোথাও দেখছে না সে। তাহলে কি......বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে সন্তোষের। বন্যার মতই চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়ে তার। টুনটুনি—তার টুনটুনি গেল কোথায়?

চা শেষ করে কাপটা নামাতে যেতেই ছবি চ্যাটার্জী হাত বাড়াল।

আমি কাপটা ফেরৎ দিয়ে ঘড়ি দেখলাম। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। বোম্বের পক্ষে কিছুই নয়। বিশেষ করে এ পাড়ায় সন্ধ্যে হচ্ছে বল্লেই হয়। ব্যানার্জীকে দেখছি না। আমায় বসিয়ে রেখে সেই যে ভেতরে গেছে এখনও পাত্তা নেই। এতক্ষণ পর এ ঘরের সঙ্গে উনিশের দুই বাড়ীর অনেক তফাৎ আছে বলে মনে হ'ল।

ছবি চ্যাটার্জীর কোঁচকানো মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম। মনে হল, আমার মত তারও চোখে-মুখে স্পষ্ট লজ্জার ছাপ। কিন্তু গোটা বাড়ীর সঙ্গে এ ঘরের অস্বাভাবিক বৈসাদৃশ্য ব্যানার্জীর দিদির সম্বন্ধে আমার ধারণা ধীরে ধীরে পাল্টে দিচ্ছে যেন। এ ঘরের সস্তা আসবাব, জানালার ময়লা পর্দা, ক্ষীণ আলো, ছবি চ্যাটার্জীর পরনের আটপৌরে তাঁতের শাড়ী, তার প্রসাধনহীন বিশুষ্ক মুখ আর অদৃশ্য অসুস্থা ব্যানার্জীর বউ—এসব মিলিয়ে যেন একটা পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেছে। প্রায় আধঘণ্টার ওপর এ ঘরে এসেছি।

এরমধ্যে বাইরে বা ভেতরে কাউকে যেতে বা আসতে দেখি নি। অথচ বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাত্র দশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে অন্যান্য ঘরে অনেক লোককে ঢুকতে বেরুতে দেখেছি। সে সব ঘরে হাসি, গান আর স্ফূর্তির জোয়ার। আর এ ঘরে কান্না, শোক আর অপমৃত্যুর স্পষ্ট পদধ্বনি। সেখানে নির্লজ্জতার উৎকট বহিঃপ্রকাশ। আর এখানে লজ্জার নিভৃত আত্ম-যন্ত্রণা।

ব্যানার্জী এল। একপ্লেট খাবার নিয়ে। আমি দারুণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। আবার এসব কেন করতে গেল। খাদ্যের প্রতি আমার কোনদিনই লোভ নেই। তাছাড়া এসব বাড়াবাড়ির কোন মানে হয় না।

আমি ঘোর আপত্তি জানিয়ে ব্যানার্জীকে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ব্যানার্জী নিজেই বলল, আমার কনভয়ে ড্রাইভারী করা শুধু এই বোম্বাই আসার সুযোগের জন্যে। গাড়ীভাড়া দিয়ে কোনদিনই যেতে আসতে পারব না। তাই বাজোরিয়া সাহেব আর মিশ্রজীকে বলে রেখেছি। বোম্বেতে গাড়ী ডেলিভারী থাকলেই আমি চান্স পাই। মিশ্রজীর এ দয়া আমি কোনদিন শোধ দিতে পারব না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্ত্রীর কিসের অসুখ?

ব্যানার্জী বলল, হার্টের। খুব উইক্। সামান্য আওয়াজ হলেই ভয় পায়।

আমি বললাম, কি করে এমন হ'ল?

ব্যানার্জী মুহূর্তের মধ্যে আনমনা হয়ে গেল। মুখখানা করুণ করে বিষণ্ণ মুচকি হেসে বলল, কপাল বাবু। নইলে এত লজ্জা নিয়ে এভাবে এখানে পড়ে থাকতে হয়।

আমি বুঝলাম, ব্যানার্জীর আত্মসম্মানে লাগছে। কিন্তু কপাল ব'লে সত্যিই যদি কিছু থাকে সম্মান-অসম্মান তো তারই সঙ্গে জড়ানো। তবে আর দুঃখ কেন? বিষণ্ণ মুখে লজ্জার ঘোমটা টেনে তবে আর আত্মাকে কষ্ট দেওয়া কেন?

ব্যানার্জীর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। ওর অসুস্থা স্ত্রীকে একবারটি দেখে যাবার জন্য ভেতরের ঘরে ঢুকলাম।

ছোট একটা দালানের মত অংশ পার হয়ে একচিল্‌তে উঠোন। উঠোনের বামদিক ঘেঁষে ওপরে যাবার সিঁড়ির মুখে আর একটা ঘর। ঘর না বলে চোরকুঠুরি বললেই ভালো মানায়। তারই মধ্যে ছোট বিছানায় শুয়ে আছে টুনটুনি।

টুনটুনি। ছোট্ট পাখি। হালকা খয়েরী রঙের দেহ বিছানায় লেপ্টে আছে। তার টুইটুই চড়া গলার স্বর আজ ক্ষীণ, দুর্বল। কত যত্নে সন্তোষকে নিয়ে সে বাসা বেঁধেছিল। আজ সে গৃহচ্যুত বন্দিনী।

জলপাইগুড়ির সবুজ বনাঞ্চলে পাখীর মতই ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, তিস্তার জলে জলে ঝুঁটি ডুবিয়ে চান করা আর বস্তির অলি-গলিতে আধমরা মানুষগুলোর প্রাণে নিজের সঞ্জীবনী হাসির স্পর্শ দিয়ে যে টুনটুনি একদিন সবাইকে ব্যস্ত করে মারত আজ সে খাঁচার মধ্যে বন্দী। আজ আর ব্যস্ততা নেই, সেই অনাবিল আনন্দের আতিশয্য নেই। আজ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা। আর মনে মনে ভাবা। দেহমন জুড়ে শুধু এক অজানা আশংকা। হারিয়ে যাবার ভয়ে শঙ্কিত হৃদয়ের কম্পিত স্পন্দন।

আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। আর মনে মনে ভাবি, কেন এমন হল ? কেন এমন হয় ?

ব্যানার্জী উত্তর দিয়েছে, কপাল।

আমি বলি, না। ব্যাধি। সামাজিক ব্যাধি। তারই ছোঁয়ায় ব্যাধিগ্রস্থা টুনটুনি আজ অকাল-মৃত্যুর দিন গুণছে।

অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে ব্যানার্জীর পিছু পিছু আবার রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াই। সেই একই দৃশ্য। আগের থেকে আরও স্পষ্ট। রাত বেড়েছে। কথা, হাসি আর উদ্দামতাও বাড়ছে। রাত আরও গভীর হবে। তখন কথা হবে প্রলাপ, হাসিতে

ঝরবে কান্না আর উদ্দামতা রূপান্তরিত হবে উচ্ছৃঙ্খলতায়। তারপর সকাল হবে। সূর্য ওঠার আগেই আঁবছা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গত রাতের ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল দেহ পরিশোধিত হবে আরব সাগরের জলে। ধুয়ে মুছে সাফ হবে দেহ। স্মৃতি রয়ে যাবে মনে। তখন দল বেঁধে সবাই ছুটবে গীর্জায়, মন্দিরে, মসজিদে। তখন কেউ কেউ জবাফুলের ডালি সাজিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ আর মহালক্ষ্মী মন্দিরে ভক্তের সারিতে গিয়ে দাঁড়াবে। কেউ ছুটবে ক্রাইষ্ট কিংবা গ্লোরিয়ার গীর্জায়। সেখানে বাতি জ্বেলে হাঁটুমুড়ে প্রার্থনা করবে, "......গিভ্ আস দিস ডে আওয়ার ডেলি ব্রেড। এণ্ড ফরগিভ আস আওয়ার ডেবটস্, এ্যাজ উই অলসো হ্যাভ ফরগিভেন আওয়ার ডেবটরস্। এ্যাণ্ড ব্রিং আস নট ইনটু টেম্পটেশন, বাট ডেলিভার আস ফ্রম দি এভিল ওয়ান।" ওদিকে জ্যাকারিয়া মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে বোরখার আড়ালে আড়ালে চলবে নিঃশব্দ প্রার্থনা, আল্লা মুঝে মাপ কিজিয়ে।

মন্দিরে, গীর্জায় বেজে উঠবে ঘণ্টা। সেই শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে আসবে টুনটুনির বন্দীশালায়। ভয়ে কেঁপে উঠবে তার ভীরু হৃদয়। একি! এ কিসের শব্দ! এ যে আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি। না না। টুনটুনিকে মেরো না। ,একজনের পরম আকাঙ্ক্ষিত বেঁচে থাকার প্রার্থনা দিয়ে আর একজনের মৃত্যুর পথকে অমন ভাবে প্রশস্ত কোরোনা। দোহাই তোমাদের। তোমরা ঘণ্টা থামাও। টুনটুনিকে বাঁচতে দাও।

সন্তোষের হাতদুটো বুকের মধ্যে রেখে ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে ওঠে টুনটুনি। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মনে মনে বলে, ওগো! বন্ধ করো ঐ ঘণ্টার শব্দ। আমার ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে। আমি মরতে চাই না। আমায় বাঁচতে দাও।

না। তবু টুনটুনি বাঁচবে না। তার অবসম্ভাবি মৃত্যুর কাছে সবাই হেরে যাবে। ডাক্তার, কবিরাজ, দৈব—কারোর আর কিছুই

করার নেই। এখন শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা আর আসন্ন মৃত্যুর দিন গোনা।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন সাগরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মহাসমুদ্র। উচ্ছল উদ্দাম ঢেউ আছড়ে আছড়ে পাথরের দেওয়ালে পড়ে ভেঙে টুকরে-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তবু ক্লান্তি নেই, তবু বিশ্রাম নেই।

মনে পড়ছে তিস্তার কথা। হিমালয় দুহিতা তিস্তার শরৎ এর ক্ষীণতোয়া রূপের মধ্যেও সেদিন হঠাৎ এমনি সাগরের· উদ্দামতা জেগেছিল। কিন্তু নদী সে। সাগরের মত প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে উদ্দামতা সংবরণ করার শিক্ষা সে পায় নি। তাই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বস্তির বাসা থেকে টুনটুনিকে টেনে হিঁচড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল নিজের বুকে। টুনটুনি ভেসে গিয়েছিল গ্রাম পেরিয়ে, সীমানা পেরিয়ে পূর্ব বঙ্গের রংপুর জেলায়।

তখন ভরা দুপুর। অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। শেখ্ শ্যামসুল হক্ উঁচু দাওয়ার ওপর বসে তামাক টানছে আর এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। তার বড় ছেলে নুরুল কোন্ সকালে মাছ ধরতে গেছে। বন্যার জলে খাল-বিল-পুকুর সব ভেসে গেছে। গ্রামে তাই মাছ ধরার ধুম পড়ে গেছে।

আজ তিনদিন সূর্য ওঠে নি। তবু শ্যামসুলের বুঝতে বাকি থাকে না যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে। নুরুলের এখনও দেখা নেই। চারিদিক থেকে বন্যার খবর আসছে। তিস্তা দিয়ে দলে দলে গরু, ছাগল, গাছের ডাল, টিন, বাঁশ, খড়ের চাল ভেসে ভেসে যাচ্ছে। শ্যামসুলের বুক কাঁপে। ছেলেটা এত দেরী করছে কেন?

দাওয়ার নিচে হাঁটুর ওপর জল। ভাগ্যিস শ্যামসুন্দর দাওয়াটা উঁচু করেছিল।

হঠাৎ একটা ছপ ছপ শব্দ। উত্তর দিকের জামাল উদ্দিনের তেতলা কোঠাবাড়ীর পাশ থেকে নুরুল বেরিয়ে এল। কাঁধে তার তিস্তার জলে ভেসে আসা টুনটুনির অচৈতন্য দেহ।

সাবারাত বাপ-ছেলেতে মিলে টুনটুনির সেবা চলল। ভোরের বেলা জ্ঞান আসতে শ্যামসুন্দর ছাড়ল না। জোর করে দুদিন আটকে রাখল। তারপব বন্যার জল কমতে দু বাপ-বেটায় টুনটুনিকে বোরখা পরিয়ে ট্রেনে করে নিয়ে এল সীমান্তে। সেখান থেকে চোরা পথে সীমান্ত পার করিয়ে ওরা ফিরে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুখের ঢাকনা খুলে চোখ মেলতেই ভূত দেখাব মত চমকে উঠল টুনটুনি। একি! ওরা কারা? ওরা অমন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে কেন? ওরা কি চায়?

চারজন মানুষ চার দিক থেকে ঘিরে ধরল টুনটুনিকে। ভয়ে আর বিস্ময়ে টুনটুনির বাকরোধ হয়ে গেল। চোখের সামনে গোটা পৃথিবী দুলে উঠল।

সেই সুরু। প্রথমে কলকাতা। তারপর বোম্বাই। প্রথমে জোর-জবস্তি, মার-ধোর, অনাহার-অত্যাচার। পরে একান্ত বাধ্য মেয়ের মত নির্বিবাদে সব কিছু মেনে নেওয়া।

এমনি ভাবেই চলছিল। হয়ত এমনি ভাবেই চলত। কিন্তু বাধ সাধল ছবি চ্যাটার্জী।

ছবি চ্যাটার্জীর স্বামী চায়ের ব্যবসার সংগে সংগে চোরা পথে কিছু অন্য জিনিষেরও কারবার করত। ফলে সমাজের কিছু নিচের

তলার মানুষের সংগে তার পরিচয় ছিল। মাঝে মধ্যে নিষিদ্ধ পল্লীতেও তার যাতায়াত ছিল। সেই একদিন নিদারুণ অসুস্থা টুনটুনিকে আবিষ্কার করল।

যে ঘরেতে টুনটুনি থাকে তারই পাশের ঘর যমুনার। ছবি চ্যাটার্জীর স্বামীর কাছে যমুনার ঘর গোপন আস্তানা। তাই তাকে যাতায়াত করতেই হত।

একদিন কথায় কথায় তার কাছে টুনটুনির গল্প করল যমুনা। বলল, পাশের ঘরের টুনটুনির দুরবস্থার কথা। টুনটুনি তাকে সব বলেছে। জলপাইগুড়ির কথা, সন্তোষের কথা।

ছবি চ্যাটার্জীর স্বামী সন্তোষের নাম শুনেই বুঝতে পারল সে আর কেউ নয়। নিজেরই শ্যালক।

বিয়ের পর বোম্বাইএ এসে ছবি চ্যাটার্জী তার স্বামীর মারফৎ সন্তোষের খবরাখবর জানার অনেক চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কোথায় সন্তোষ! ছবি চ্যাটার্জীর স্বামী প্রথম প্রথম কিছুদিন জলপাইগুড়িতে খোঁজ খবর নিয়েছিল কিন্তু সন্তোষ তখন কলকাতায় নন্দলালের কাছে ড্রাইভিং-এ তালিম নিচ্ছে। অগত্যা ছবি চ্যাটার্জীর চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

ঠিক এই সময় একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীর মুখে টুনটুনির গল্প শুনে কেঁদে ভাসিয়ে দিল ছবি। এই মুহূর্তে তাকে টুনটুনির কাছে নিয়ে যেতে হবে। সে নিশ্চয়ই সন্তোষের খবর জানে।

মহা ফাঁপরে পড়ল ছবির স্বামী। সে জায়গায় ছবিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ছবি কেঁদে উঠল, কেন সম্ভব নয়? তাহলে কি আমার একটি মাত্র ভাই-এর সন্ধান আমি কোনদিন পাবো না? সব জেনেশুনেও কি এমনি ভাবে নিজের ভাই-এর বউকে একটু একটু করে মরণের দিকে ঠেলে দেব?

উত্তর খুঁজে পায় না ছবি চ্যাটার্জীর স্বামী। কথাটা খুবই সত্যি।

কিন্তু তার চেয়েও সত্যি টুনটুনির পরিবেশ।

তবু ছবি চ্যাটার্জীর স্বামী না বলতে পারে না। যদি তার কাছ থেকে সন্তোষের কোন খবর পাওয়া যায় তবে তাকে খবর দিয়ে আনতে পারলেও হয়ত টুনটুনির উদ্ধার হতে পারে। এই ভেবেই একদিন যমুনারই চেষ্টায় ছবির আর টুনটুনির মিলন হ'ল।

কিন্তু হায় ঈশ্বর! টুনটুনির তখন কিছুই বলার নেই। সে শুধু চেয়ে চেয়ে ছবি চ্যাটার্জীকে দেখল। কোন কথাই মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারল না।

ছবি চ্যাটার্জী কেঁদে লুটিয়ে পড়ল স্বামীর পায়ে, ওগো, আমার সবাই গেছে। সন্তোষ আজ কোথায় জানি না। আজ এমনি ভাবে টুনটুনিও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে সে আমি হতে দেবো না। তুমি টুনটুনিকে আমাদের বাড়ী নিয়ে চল।

ছবি চ্যাটার্জীব স্বামীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এ যে অসম্ভব কথা! এখানে যে একবাব আসে সে আর কোনদিন ফিরে যেতে পারে না। তাছাড়া কঠিন অসুখ টুনটুনির। সামান্য নড়াচড়াতেও বিপদ হতে পারে।

কিন্তু ছবি চ্যাটার্জী এসব কথা বুঝতে চায় না। এতদিন পর ভাই-এর সন্ধানের সূত্র খুঁজে পেয়ে তার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মাল—সন্তোষ একদিন না একদিন ফিরে আসবেই।

এ অবস্থায় কি করা উচিত ছবি চ্যাটার্জীর স্বামী তা ভেবে পেল না। সে যমুনাকে ধরল। যেমন করে হোক একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

যমুনা না বলতে পারল না। তার পাশের ঘরের টুনটুনিকে সে আজ কয়েক বছর ধরে দেখছে। বয়সে সে যমুনার থেকে অনেক ছোট। তাই যমুনাকে সে দিদি বলে। যমুনা বরাবর লক্ষ্য করে আসছে, টুনটুনি কিছুতেই নিজেকে এ লাইনে খাপ খাওয়াতে পারছে না। সুযোগ পেলেই সে পালাবার তাল খোঁজে। তার

ঘরে যারা আসতে চায় তাদের কাছে কান্নাকাটি করে, এটা সেটা বুঝিয়ে সে এই পরিবেশের বাইরে বেরুতে চায়।

কিন্তু তবু সুযোগ আসে না। বরং উল্টো ফল হয়। বাড়ী-ওলার কাছে রিপোর্ট যায়।

টুনটুনির স্বপ্ন ভেঙে যায়। মুক্তির নেশা তাকে পাগল করে তোলে। মরিয়া হয়ে মরতে চায় সে।

কিন্তু না। এখানে মরবারও স্বাধীনতা নেই। এখানে বেঁচে থাকতেই হবে। টুনটুনিকে বাঁচিয়ে রাখলেই এখানে লাভ।

অগত্যা হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ে টুনটুনি। তাহলে কি কোনদিন সে মুক্তি পাবে না? তাহলে কি কোনদিন সে সন্তোষের কাছে ফিরে যেতে পারবে না?

ভাবতে ভাবতে নিঃসীম শূন্যতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় টুনটুনি। তার প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। থেকে থেকে আচমকা চমকে ওঠে সে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে।

পাশে দাঁড়িয়ে যমুনা প্রশ্ন করে, কিরে, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

টুনটুনি সামলে নেয় নিজেকে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উঠে আবার ঠিক হয়ে দাঁড়ায়।

ক্রমে দিন যায়, রাত আসে। ঘরে ঘরে শাঁখ বাজে। সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে। ধূপের গন্ধে চারিদিক ভরে যায়।

টুনটুনির বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ে। সন্ধ্যে হলেই একটা আতংকে তার মন ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে সে। জোরে দম নেয়। তারপর মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়ে।

তবু এরই মধ্যে তাকে সাজতে হয়। এলোচুলে খোঁপা বেঁধে তাতে বেলফুলের মালা জড়াতে হয়। তার রক্তহীন বিবর্ণ ঠোঁট জোড়াকে রঙে চুবিয়ে নিতে হয়।

তারপর এগিয়ে আসে অন্তিম মুহূর্ত। ঘরে কেউ ঢুকলেই ভয়ে চিৎকার করে ওঠে সে। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা নিয়ে জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

যথাসময়ে যথাস্থানে খবর যায়। ডাক্তার আসে। মিক্সচার আসে। যমুনা কপালে জলপটি দেয়। গরম তেলে রসুন ফেলে বুকে মালিশ করে।

কিন্তু সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে টুনটুনি সত্য সত্যই জিতে যায়। যারা তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল তারা হেরে গিয়ে নিরাশ হয়।

টুনটুনি এগিয়ে চলে। তার পরম আকাঙ্ক্ষীত মরণের সন্ধান পেয়েছে সে। তার মুক্তির পথে যাত্রা সুরু হয়। আনন্দে দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ক্রমে কথা হারিয়ে যায়। দেহ পাথর হয়। চঞ্চল চোখের তারা স্থির নিস্পন্দ হয়ে দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়। মাথার ভেতর সব ওলোট-পালোট হয়ে যায় টুনটুনির। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায় সে।

ছবি চ্যাটার্জীর কান্না থামতে চায় না। না না। সে কিছুতেই এ অবস্থায় টুনটুনিকে ফেলে রেখে যেতে পারে না।

অগত্যা যমুনাকে চেষ্টা করতেই হয়। টুনটুনির জন্য বাড়ীওলার হাতে পায়ে ধরে সে।

অবশেষে স্থির হ'ল, ছবি চ্যাটার্জী আর তার স্বামী টুনটুনির ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবে। টুনটুনি মরে গেলে এ ঘর তাদের ছেড়ে দিতে হবে।

আনন্দে যমুনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছবি। টুনটুনির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে কান্নায় ভাসতে ভাসতে বলে, তুমি ভেবো না বউ। আমি বলছি, একদিন না একদিন সন্তোষ ফিরে আসবেই। আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম, সেই অভিমানে সে আমাদের ভুলে আছে। কিন্তু দেখো, সে পারবে না। অভিমান করে কিছুতেই সে

আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না।

টুনটুনি উত্তর দেয় না। উত্তর দিতে সে পারে না। ছবি চ্যাটার্জীর সান্ত্বনায় তার দু'চোখের তারায় আশার আলো চিক্ চিক্ করে ওঠে।

সেদিন আগরওয়ালা এণ্ড কোম্পানীতে গাড়ী ডেলিভারী দিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরার আগে হঠাৎ সন্তোষের খেয়াল জাগল একবার লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাবে। বহুদিন বহু মন্দিরে সে পূজো দিয়েছে। কিন্তু বোম্বে এসে তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরার তাগাদা থাকায় কোনবারেই তার সুযোগ হয় না।

তখনও সন্ধ্যে হয়নি। বোম্বাই-এ সন্ধ্যা অনেক দেরী করে আসে। হাতে ফুলের ডালি নিয়ে মন্দিরে ঢোকার মুখেই দিদির সংগে তার চোখাচোখি হ'ল।

প্রতিদিন মন্দিরে পূজো দিয়ে রোগগ্রস্থা টুনটুনির সারা শরীরে দেবতার চরণামৃত বুলিয়ে দেওয়া ছবির নিত্যকর্ম।

আজও সে তেমনি পূজো দিতে এসেছিল।

সন্তোষের কলকাতা ফেরা মাথায় উঠল। একই সংগে নিরুদ্দিষ্ট দুই প্রিয়জনের সন্ধান পেয়ে সে কাঁদবে না হাসবে বুঝতে পারল না।

ছবি চ্যাটার্জীর কান্না কিন্তু অনেক আগেই সুরু হয়ে গেছে।

ভাইয়ের হাত ধরে বাচ্চা মেয়ের মত সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

তারপর একসময় সন্তোষকে নিয়ে টুনটুনির শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াল।

সন্তোষের মাথা ঘুরে গেল। হায় ভগবান! এ তুমি কি করলে? কেন এ চরম শাস্তি দেবার জন্য আমাকে এখনও বাঁচিয়ে

রাখলে ? এ দৃশ্য যে চোখে দেখা যায় না।

এদিকে টুনটুনি নিথর, নিস্পন্দ। সে শুধু অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সন্তোষের মুখের দিকে। ঝাপসা দৃষ্টি তার। কে এই লোকটা ? কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি। মনে করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সব গুলিয়ে যায়। স্মৃতি শক্তি তার বড় দুর্বল। কিছুই সে মনে রাখতে পারে না।

ছবির কথা কানে যায়। অনেক দূর থেকে কথাগুলো হাওয়ায় ভেসে আসছে যেন।

মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছবি চ্যাটার্জী বলে, সন্তোষ এসেছে। সন্তোষ।

সন্তোষ! সন্তোষ! মনের কোণে কোণে হাতড়ে বেড়ায় টুনটুনি। কে সন্তোষ ? কার সন্তোষ ? কোথায় সন্তোষ ?

সন্তোষ উন্মাদ হয়ে ওঠে। দুর্নিবার এক প্রতিশোধের স্পৃহায় দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে সে।

কিন্তু কার ওপর সে প্রতিশোধ নেবে ? জলপাইগুড়ির আকাশের ওপর, তিস্তার জলের ওপর, নাকি নিজের অদৃষ্টের ওপর ?

সাগরের ধারে ভ্রমণ-বিলাসীদের ভীড় বাড়ছে। কথা, হাসি আর টুকরো টুকরো গানের কলি কানে ভেসে আসছে। তারই সংগে জলের শব্দ।

আমি আর ব্যানার্জী দুজনেই জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বহুদূর ছড়ানো সাগরের তীরে লাইন দিয়ে ফেরিওলা বসেছে। তাদের কাছে কাছে গ্যাসের আলোর ছটা এসে পড়েছে জলে। সেই আলো ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চিক্ চিক্ করে জোনাকির মত জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। আবার জ্বলছে।

আমরা দুজনেই নির্বাক। ঢেউ-এর ফাঁক গলে টুনটুনির পরিপূর্ণ মূর্তি কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। তাই বার বার ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

আমার হঠাৎ কেমন সন্দেহ হ'ল। ব্যানার্জীর দিকে তাকালাম। দেখলাম ওর চোখে জল।

আমার সান্ত্বনা জানানো উচিত। কিন্তু কি বলে ওকে সান্ত্বনা দেবো! বলবো যে, কেঁদো না! টুনটুনি একদিন ভালো হয়ে উঠবেই!

সেই মুহূর্তে নিজেকে ব্যানার্জীর থেকেও অসহায় মনে হ'ল। আমার ওপর ব্যানার্জী এখন ভরসা করে আছে। আর সেই আমি, নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে ব্যানার্জীর কান্না দেখছি।

এতক্ষণে ব্যানার্জী বোধহয় সম্বিৎ ফিরে পেল। চোখের জল গোপন না করে সাগরের দিকেই তাকিয়ে বলল, দুঃখে ভেঙে পড়ার ছেলে আমি নই বাবু। জ্ঞান হবার পরেই মা-বাবাকে হারিয়েছি। তারপর দিদির হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। একা একা কষ্ট হ'ত বটে তবুও তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই নি। এরই মধ্যে কিছুদিনের জন্যে টুনটুনিকে পেয়ে একটু সুখের মুখ দেখতে না দেখতেই বন্যার জলে সব নয়ছয় হ'য়ে গেল। তবু হাল আমি এখনও ছাড়ি নি। সবাই জানে টুনটুনি বাঁচবে না। আমিও জানি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন বাঁচবে না টুনটুনি?

উত্তেজনার মাথায় ব্যানার্জী আমার দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলাম, আবছা অন্ধকারে আগুনের ডেলার মত ওর চোখ দুটো জ্বলছে।

আমি বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনন্ত এ প্রশ্ন: অব্যক্ত এর উত্তর।

আত্মীয়ের বাড়ী ফিরে এলাম। রাত এগারোটা বেজে গেছে।

পাঁচতলার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেই ক্লান্ত হয়ে বিছানায় বসে পড়লাম। নিদারুণ একটা হতাশা পেয়ে বসলো আমাকে। মনে হ'ল, বদ্ধ শহুরে জীবন থেকে কয়েকদিনের জন্য পালিয়ে এসে খোলা বাতাসে মুক্তির শ্বাস নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তবু এত শ্বাসকষ্ট কেন? কেন ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে বুক? কেন ডেলা ডেলা কান্না গলায় এসে জমা হয়?

বুঝলাম, মুক্তি নয়, বন্ধন। চিরকালীন এক বন্ধনের সংগে আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে আছি। এর কোথাও মুক্তি নেই। এ বন্ধন ছিঁড়ে যতদূরেই পালাতে চাই না কেন ফিরে আমাদের আসতেই হবে।

পরের দিন ভোর হ'ল। কিন্তু অন্যদিনের মত আমার ঘুম ভাঙ্গার সময় পেরিয়ে গেল। কাল রাতে ঘুমের সংগে প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছে। টুনটুনিকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারিনি। এলোপাতাড়ি কত কি ভেবেছি। চেনা-জানা বড় বড় ডাক্তারদের, ভালো ভালো হাসপাতাল, নার্সিংহোমের কথা একটার পর একটা মনে পড়েছে। কত ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্র-তন্ত্র, জলপড়া মাদুলি। দৈবী প্রভাবে কত অসম্ভবই তো সম্ভব হয়েছে। যদি কোনরকমে টুনটুনিকে বাঁচানো যেত। কল্পনা-বাস্তব, সাধ্য-অসাধ্য অনেক কিছুই ভেবেছি। কোনটারই কুল-কিনারা পাইনি। শেষে হতাশ হয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে আটটায়। বেশ আরাম করে বার কয়েক আড়মোড়া ভেঙে আরও কয়েক মিনিট বিছানায় পড়ে রইলাম। কোন ব্যস্ততা নেই। এখনই তেল মেখে টাইম কলে লাইন দিতে হবে না। এখনি আতপ চালের ভ্যাপসা গন্ধ নাকে নিয়ে পড়ি কি মড়ি করে রিটার্ন টিকিট কাটতে রামকেষ্টপুরের লঞ্চ-ঘাটে ছুটতে হবে না।

এখন যতক্ষণ খুশি বিছানায় পড়ে থাকো। কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে

পাঁচতলার জানালা দিয়ে বোম্বাই-এর জনস্রোত দেখো। কত মানুষ। কত ভঙ্গি।

কিন্তু তবু উঠে বসি। গা-হাত-পা ম্যাজ ম্যাজ করছে। একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোলে এমনই হয়। কিছু ভাল লাগে না।

দু'দিনের একদিন কেটে গেছে। আজ রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাব। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে। এরই মধ্যে কিছু কেনাকাটা করতে হবে।

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে আত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়ে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে বেড়ালাম। কেনবার মত কিছুই নেই। তবু কিনতে হবে। নইলে সবাই কৃপণ বলবে।

দোকান থেকে বেরোবার মুখেই বিভাসকে দেখতে পেলাম। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, অবিন্যস্ত মাথার চুল। লম্বা ঝুল-ওয়ালা রঙীন বড়ুয়া পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে একরাশ ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনে ট্যাক্সীতে বোঝাই করছিল। আমাকে দেখেই ছোঁ মারাব মত আত্মীয়দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্যাক্সীতে চাপালো।

অনেক বোঝালাম। আজ রাতেই ট্রেন। একেবারে সময় নেই। আবার এলে নিশ্চয়ই ওর বাড়ী বেড়াতে যাবো।

কিন্তু বিভাস বুঝল না। বিভাস বোঝে না। কোনদিন কারোর কথা বুঝে চলা ওর ধাতে সয় না। ছেলেবেলায় কত লোক বুঝিয়েছে ওসব ছবি-টবি আঁকা বড়লোকী নেশা। গরীবের ছেলে শেষে না খেয়ে মরতে হবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। বিভাস সত্যি সত্যিই না খেয়ে আজও বেঁচে আছে। বছর দশেক হ'ল বোম্বাই-এর ফিল্ম স্টুডিও পাড়ায় আর্ট ডিরেক্টার হয়ে এখানেই পড়ে আছে। আয় সামান্য। সে তুলনায় ব্যয় অনেক বেশী। তবু কোনদিন আর্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না।

শহরতলির শেষপ্রান্তে ছোট দু-খানা ঘর নিয়ে আছে। একটা ঘর ঠাসা আঁকার সরঞ্জাম। কিছু অয়েল পেন্টিং, নানান রকমের স্কেচ। দু-তিনটি অসমাপ্ত মাটির সরস্বতী প্রতিমা। ছোট ছোট মডেল। ফেস্টুন, ব্যানার, সাইন বোর্ড, নেম প্লেট।

বুঝলাম, সব কিছুর ভেতর দিয়ে দারিদ্র্যতা তাড়াবার নিদারুণ প্রচেষ্টা।

একটা রঙমাখানো টুলে খবরের কাগজ পেতে আমায় বসতে দিল বিভাস। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চক্রবেড়ের খবর নিতে লাগল। বিদ্যামন্দির কেমন চলছে? দালাল পুকুরের পাশের মাঠে এখনো পাড়ার ছেলেরা ফুটবল খেলে কিনা? বারুইপাড়া আনন্দ-সমাজের যাত্রাদল আছে না উঠে গেছে?

আমি যথাসম্ভব উত্তর দিলাম।

বিভাস অনুযোগ করল, তোরা সব ক্যালাস হয়ে গেলি। দিন দিন সব কিছু তুলে দিচ্ছিস। তারপর, তোর নাটক কেমন চলছে বল। আরে, এক আধটা নাটক-টাটক কর। নইলে সব ঝিমিয়ে যাবে যে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, বেশ। সামনের পূজোয় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন মঞ্চস্থ করব। তোকে কিন্তু রঘুপতির রোল নিতে হবে।

বিভাস বেলুনের মত চুপসে গেল। বেশ কষ্ট করে হেসে বলল, ইচ্ছে হয় রে। কিন্তু এখানে ওসব সুযোগ পাই না।

আমি অবাক হই।

—সেকি রে! ভারতবর্ষের সেরা ফিল্মের জগতে থেকে তুই এ্যাকটিং করার সুযোগ পাস না!

বিভাস বলল, এ্যাকটিং করি না যে তা ঠিক নয়। এই যেমন তোর সংগে করছি।

আমি জোর দিয়ে বললাম, আলবৎ এ্যাকটিং করছিস। আচ্ছা, এত কষ্ট করে আছিস কি করে? এ লাইনে তোর তো অনেক দিন

হ'ল না। তবু কিছু সুরাহা হ'ল না ?

সিগারেটের কাগজে মশলা মুড়তে মুড়তে বিভাস বলল, হয়ে কি লাভ বল্। "দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কিসের ?"

বিভাস হালকা হতে চাইছে। হালকা হয়েছেও। দশ বছর আগে ওর দেহের ওজনের অর্ধেকও এখন নেই। চোখের কোলে কালি পড়েছে। এই বয়সেই মাথার চুলে পাক ধরেছে।

সন্ধ্যের আগেই জোর করে হোটেলে ঢুকিয়ে রাতের খাওয়া খাইয়ে যথাসময়ে আমার আত্মীয়ের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বিভাস ফিরে গেল। যাবার সময় বেশ সিরিয়াস হয়েই বলে গেল, বিদ্যামন্দিরের জুনিয়ারকে এবার হাইস্কুল করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যা। আর সব ক্লাসে একটা করে আঁকার পিরিয়াড্ রাখবি। আমায় খবর দিলে স্টুডিওর চাকরী ছেড়ে আমি ঐ বিদ্যামন্দিরের ছবি আঁকার ক্লাসগুলো নেবো। যা পারবি তাই দিবি। কোন জোরজবস্তি নেই। আমি একা লোক। কোন রকমে চলে গেলেই হ'ল।

ছবি আঁকায় আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। স্কুলের ড্রয়িং-এ কোনদিন আট-এর বেশী নম্বর পাই নি। তবু মনে হ'ল, এভাবে মানুষের চরিত্র না এঁকে যদি সত্যিই ছবি আঁকতে শিখতাম তাহলে আর কিছু নাই হোক অন্ততঃ বিভাসের মত উদার হতে পারতাম।

রিজার্ভেশন চার্ট দেখে নিজের জায়গায় গিয়ে আমি তো হতভম্ব। কি ব্যাপার! আমার জায়গায় অন্য এক যুবতী। শালোয়ার কামিজ পরনে দিব্যি পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

আমি তো অবাক! আমার আত্মীয় বারকয়েক এটা সেটা সম্বোধন

করে ডাকাডাকি করলেন। কোন সাড়া নেই।

আমি আবার বাইরে এসে চার্ট দেখে নাম মেলালাম। না। ঠিকই আছে। নামের পাশে যে সংখ্যাটি জ্বল জ্বল করছে সেটিতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে অচেনা ঐ যুবতীটি। ভারি মুশকিলে পড়া গেল। ডাকলে সাড়া দেয় না। এই সন্ধ্যেতেই ঘুমে অচেতন।

আমার আত্মীয় রেগে লাল! রেলওয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ডেকে আনতে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন।

সেই অবসরে যুবতী ঘুম ভেঙে উঠে বসলো। তারপর চোখবুজে আড়মোড়া ভাঙতে যেতেই হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমি কিছু বুঝে ওঠবার আগেই মেয়েটি লাফ দিয়ে আমার সামনে নেমে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার চুলের মিষ্টি তেলের গন্ধ পেলাম। আঃ! ভারি সুন্দর গন্ধ!

মেয়েটি এবার সিটে বসলো। তারপর মাথাটা দুবার ঝাঁকিয়ে তার কালো রেশমের মত হালকা চুলগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে মাথাটা জানালার ধারে রেখে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

আমি আবার তার চুলের গন্ধ পেলাম। একটু ইতস্ততঃ করে কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলাম।

ট্রেন ছাড়তে এখনো আধঘণ্টারও বেশী সময় বাকি আছে। রিজার্ভ কামরা। গোটা কামরা এখনো প্রায় খালিই পড়ে আছে। দু-চারজন যারা উঠেছে তারা মেয়েটির হাসি শুনে চোরা চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি কথা না বলে মেয়েটির দিকে তাকালাম। ছিমছাম চেহারা। একটু লম্বাটে ধরণের মুখে বসন্তের দু'একটা দাগ। মুখশ্রী সুন্দরই বলতে হবে। ফর্সা গায়ের রঙে ঈষৎ হলদেটে ভাব। দেখলে মনে হয় খুব স্মার্ট।

হাসতে হাসতে মেয়েটি বোধহয় হাঁপিয়ে উঠল। জানালা থেকে

মাথাটা তুলে জোরে দম নিয়ে বলল, আমায় এখনো চিনতে পারছেন না ?

আমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম।

মেয়েটি বলল, তবে যে বড়া ভাইয়া বলল আপনি দেখলেই আমাকে চিনতে পারবেন।

আমি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম, বড়া ভাইয়া !

সে বলল, হাঁ। আলি সাহেব।

আমার মনে পড়ে গেল। সংগে সংগে বললাম, তুমি সোনালী।

সোনালী এবার মুচকি হেসে ঘাড়টা একপাশে কাত করে পাকা মেয়ের মত বলল, ভাগ্যিস ! আলি সাহেবের নাম না করলে আপনি বোধহয় সত্যি সত্যিই তাড়িয়ে দিতেন।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, না না তাড়িয়ে দেবো কেন ? আসলে এই প্রথম দেখছি তো।

—কিন্তু আপনার সংগের ভদ্রলোক তো রেগে-মেগে লোক ডাকতে গেলেন। ফিরে এসে না জানি কি করবেন।

—কি আবার করবেন। তোমাকে নামানোর জন্যই তো গেছেন। এসে দেখবেন তুমি নেমে পড়েছ। কিন্তু তুমি আমার খবর জানলে কি করে ?

সোনালী বলল, সে কথা পরে বলছি। আগে বিছানাটা পেতে ফেলুন তো। ট্রেন ছাড়তে বেশী দেরী নেই।

কথাটা বলেই লাফিয়ে বাংকের ওপর উঠে নিজেই টানাটানি ক'রে আমার বিছানা খুলতে লাগল।

বিছানা ! নামেই বিছানা। আমি তো কিছুই আনিনি। আমার আত্মীয়া জোর ক'রে একটা সতরঞ্চ আর একটা চাদর মিলিয়ে ছোট বিছানা সাজিয়ে দিয়েছেন। সংগে একটা বালিশ।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আরে, তুমি ছেড়ে দাও। বিছানা আমি পেতে নিচ্ছি। তোমার কোথায় লেগে-টেগে যাবে।

সোনালী বলল, কিচ্ছু লাগবে না। বস্তিতে প্রতিদিন লাইন দিয়ে বিছানা পাততে হয় আমাকে। তাছাড়া এসব তো আমাদেরই কাজ।

কথা বলতে বলতেই বিছানা পেতে আবার নীচে লাফিয়ে পড়ল সোনালী। মেয়ে হলেও খুব দ্রুত হাত চলে তার। বেশ ছট্‌পটে।

নিচের সিটে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, তখন কি জিজ্ঞেস করছিলেন আমাকে? আপনি যে এই গাড়ীতে কলকাতায় ফিরছেন—এ খবর পেলাম কোথায়। এইত?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তো আলি সাহেবকে এসব কথা কিছু বলিনি।

সোনালী বলল, আলি সাহেবকে কেউ কিছুই বলে না। ভাইয়া সব জানতে পারে।

— কি ক'রে?

—তা জানিনা। আজ সকালে একজন লোক মারফৎ ভাইয়া খবর পাঠালে যে আপনি এই ট্রেনে কলকাতা ফিরছেন। অতএব আমি যেন খুব তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছে আপনাব উপকারে লাগতে পারি। তাড়াতাড়ি যে এসেছি তার প্রমাণ তো পেলেন। এবার বলুন, আপনার আর কি উপকারে লাগতে পারি?

সোনালী হাত জোড় করে নিতান্ত বিনীতভাবে আমার সামনে মাথা হেঁট করে আদেশের অপেক্ষায় উঠে দাঁড়াল।

আমার হাসি পেল। ভারি ডেঁপো মেয়ে তো।

রসিকতা করে বললাম, যদি বলি এট্‌কু উপকারে আমি সন্তুষ্ট নই।

চোখে তির্যক দৃষ্টি হেনে সোনালী বলল, তবে পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য কি করতে হবে বলুন।

—তোমাকে আমার সংগে যেতে হবে।

—কোথায় ?

—কলকাতায়।

—সোনালী চোখ কুঁচকে হাসি চেপে বলল, তারপর ?

—তারপর সোজা খবরের কাগজের অফিসে।

—সেখানে কেন ?

—তোমাকে দেখে তারা তোমার চেহারার বর্ণনা লিখে নিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন: বোম্বাই প্রবাসী বাঙালী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই।

সোনালী হো হো করে হেসে উঠল। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, ভাইয়া তাহলে আপনাকেও এ কথা বলেছে ?

আমি বললাম, বলবে না! এ কেমন কথা! ঘরে আইবুড়ো বোন থাকলে কোন্ ভাই-এর না ভাবনা হয়।

সোনালী হঠাৎ গম্ভীর হল। বলল, না। বিয়ে আমি করব না।

আমি অবাক হলাম, সেকি!

সোনালী একই ভাবে বলল, ভাইয়াকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

আমি আশ্বস্ত হলাম। বললাম, ওটা ছেলে মানুষের কথা।

সোনালী আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, আপনার কি মনে হয় আমি খুব বুড়িয়ে গেছি ?

—তা কেন হবে। তবে বিয়ের বয়স নিশ্চই হয়েছে।

—তা হয়ত হয়েছে। কিন্তু বিয়ে না করলেই বা কি এসে যায় ?

—হয়ত কিছুই এসে যায় না। সেটা অন্য কথা। কিন্তু বিয়ে না করার চিন্তাটাই বা আসবে কেন ?

—ঐ যে বললাম। ভাইয়াকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না।

—কিন্তু আলি সাহেবের তো একটা ইচ্ছা আছে। আশা

আছে। সবার ওপর রয়েছে দায়িত্ব। সে গুলোর কথা তোমায় চিন্তা করতে হবে।

—আর আমি চলে গেলে ভাইয়ার কথা কে চিন্তা করবে?

এবার আমি চুপ করলাম। আসন্ন বিচ্ছেদের আগে প্রিয়জনকে ছেড়ে যাবার কষ্ট অনেক। বুক ফেটে যায়। চোখ জলে ভরে ওঠে। অজস্র স্মৃতি পথরোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু তবু বিচ্ছেদ আসে। তবু ছেড়ে যেতে হয়।

আমি বললাম, তা ঠিক। তবু যা স্বাভাবিক সেটা মেনে নেওয়াই ভাল।

সোনালী বলল, আপনার কাছে যা স্বাভবিক আমার কাছে তা নাও হতে পারে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, ছেলেমানুষ সোনালী কিছুই জানেনা। এখন ওর চোখে মায়ার কাজল। তাই বিচ্ছেদটাই বড় করে দেখছে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সোনালী বলল, কি ব্যাপার? ঘটকালি হাতছাড়া হয়ে গেল বলে ভাবনায় পড়ে গেলেন বলে মনে হচ্ছে যেন।

আমি মুচকে হাসলাম।

এমন সময় আমায় আত্মীয় ফিরে এলেন। সংগে কালো পোষাকের একজন রেলওয়ে কর্মচারী।

সোনালী আমার দিকে তাকিয়ে ওড়না মুখে দিয়ে হাসি চেপে জানালার ধারে সরে গিয়ে বসল।

আমি ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিলাম।

আমার আত্মীয় বোকার মত রেলওয়ে কর্মচারী ভদ্রলোকটিকে বললেন, এক্সকিউজ মি। উনি নেমে গেছেন। আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম।

ভদ্রলোক নামতে নামতে বললেন, তাতে কি হয়েছে। এটা

আমার চাকরি।

ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

আমার আত্মীয় এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

আর আমাদের ছু-জনের অবস্থা দেখে সোনালী খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমি ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে কোন রকমে সামলে নিয়ে আমার আত্মীয়কে বললাম, প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারিনি। আমার খুব জানাশোনা। সোনালী। সোনালী রায়।

আমার আত্মীয় বোম্বাই-এ বহুদিন আছেন। খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে ম্যানেজ করে বললেন, কাণ্ড একখানা বাঁধিয়ে ছিলে আর কি। তোমাদের জন্যে দেখছি আমারই পানিশমেণ্ট হয়ে যেত।

সোনালী আবার জোরে হেসে উঠল। আমার আত্মীয়ও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা হাল্কা হ'ল।

ট্রেন ছাড়তে আর পনের মিনিট বাকি। কামরায় ভীড় বাড়ছে। দূর পাল্লার গাড়ী। যাত্রীর থেকে বিদায়ী আপনজনের ভীড়ই বেশী। আমার সামনের শ্লিপারে এক নব-দম্পতি এসে বসল।

সোনালী সিট ছেড়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে কারোর জন্যে অপেক্ষা করছে যেন।

আমার আত্মীয় ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়লেন। ব্যবসায়ী মানুষ। চব্বিশ ঘণ্টাই এনগেজড্। জরুরি কাজ। এখুনি চলে যেতে হবে। অতএব আমার বিদায়ের আগেই তিনি বিদায় নিলেন।

সোনালী ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

আমি একা সিটে বসে আছি। আমার সামনে নব-দম্পতিকে বিদায় জানাতে যারা এসেছে গোটা সিটে তাদের সকলের জায়গা হচ্ছে না। কেউ কেউ আমার জায়গায় বসে পড়েছে।

আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তবু উঠে দাঁড়িয়ে কামরার এদিক-ওদিক একবার ঘুরে নিলাম। বলা যায় না। হয়ত কোন পরিচিত জনের খোঁজ পেতে পারি।

কিন্তু না। অনেকের সংগেই অনেকে আছে। আমার সংগে কেউ নেই। আসবার সময় যারা ছিল তারা কেউ কেউ এতোদিনে কলকাতায় ফিরে গেছে। কেউ ফিরতি পথে গাড়ী পাবার আশায় অপেক্ষা করছে।

এমন সময় ওরা এল।

ওরা মানে একটা গোটা রাজত্ব। রাজা-প্রজা, প্রাত্র-মিত্র-অমাত্য মিলে প্রায় পঞ্চাশ জনের একটা দল।

সোনালী খুশিতে ভেঙে প'ড়ে হাততালি দিয়ে উঠল। একেবারে ছেলে মানুষের মত বিচিত্র ভঙ্গিতে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই আনন্দে নাচতে সুরু করল।

ওরা এসে কামরায় ঢুকল। কামরা ভরে গেল। এতক্ষণ একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এবার ভীড়ের চাপে হাঁপিয়ে উঠলাম।

ওদের একজনের হাতে একটা বড় খাবারের প্যাকেট। আলি সাহেবের হাতে একটা গোলাপ ফুলের তোড়া।

কেউ কিছু বলার আগেই সোনালী আলি সাহেবের হাত থেকে ফুলের তোড়া ছিনিয়ে প্রাণভরে লম্বা শ্বাস টেনে বলল, আঃ! লাভলি!

পরে আমার দিকে ফুলগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিন ধরুন। আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

সোনালী কোমর ভেঙে মাথা নত করে যে ভঙ্গিতে আমায় ফুলগুলো দিল তা দেখে সত্যিই আমার হাসি পেল।

ফুলগুলো হাতে নিয়ে আমিও ঘ্রাণ নিলাম। সত্যিই সুন্দর। রূপ আর গুণ দু-এ মিলে গোলাপ এখনো ফুলের রাজা। তেমনি আলি সাহেবকেও নতুন লাগছে। চুস্তের ওপর আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবীতে ছিপছিপে আলি সাহেবকে আরও খানিকটা লম্বা দেখাচ্ছে। সব সংগীর মাঝে তাকে সত্যিই রাজার মত দেখাচ্ছে।

খাবারের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আলিসাহেব বলল, বাবুজী, আমরা এতজন মিলে আপনার কাছে এসেছি বলে গোঁসা করবেন না। আপনার কাছে এদের আনবার দরকার ছিল। আপনি তো কিতাব লিখেন। দেশ-বিদেশে অনেক আদমী আপনি দেখেছেন। বোম্বাই-এর এই বস্তির আদমীদের দেখে যান বাবুজী। এরা বস্তিতে বাস করে। লেকিন এদের দিল আছে। এরা গরীব আদমী তাই দুখ আছে। লেকিন হামি ওদের দুখ দিতে চাই না। হামি বলি, খাও-পিও-জিও।

আলি সাহেব থামল। দলের সবাই নিঃশব্দে ওর কথা শুনছে। সোনালীও মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। তার কথা, হাসি সব বন্ধ। একান্ত বাধ্য মেয়ের মত মনোযোগ দিয়ে ভাইয়ার কথা শুনছে সে।

আমি বুঝলাম, এ সমস্তই আলিসাহেবের ট্রেনিং। বস্তিবাসী উচ্ছৃঙ্খল মানুষগুলোর কানে এমনি ভাবেই বাঁচার মন্ত্র দিয়ে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যেই আলি সাহেবের এ প্রচেষ্টা।

আলিসাহেব আবার বলল, বাবুজী, আপনি চলে যাচ্ছেন। লেকিন আমাদের ভুলে যাবেন না তো ?

আমি ধরা ধরা গলায় বললাম, ভুলব কেন ? এসব কি ভুলে থাকা যায় ?

আলিসাহেব বলল, তাহলে আমাদের নিয়ে একটা কিতাব লিখবেন। লিখবেন এই বস্তির আদমীদের কথা। লিখে একটা কিতাব ভেজিয়ে দেবেন বাবুজী। আমার সোনালী বহিন পড়ে শোনাবে।

আমার মনে পড়ে গেল সোনালীর বিয়ের কথা। এইত সেদিন মহম্মদ আলি বহিনের সাদী দেবার জন্যে আমায় পাত্রের খোঁজ নিতে বলল। আমি যদি সত্যিই খোঁজ নিই তাহলে তো সোনালীর বিয়ে হয়ে যাবে। সে তো শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে। তবে আর কি করে সে আলি সাহেবকে বই পড়ে শোনাবে। বুঝলাম, মহম্মদ আলি আর সোনালীর অবচেতন মন, জাতি, ধর্ম আর সামাজিকতার বাহ্যিক অনুশাসন ভেঙে চিরকাল এক হয়ে মিশে থাকবে অথচ তাদের চেতন মন একের কর্তব্য আর অন্যজনের ভালবাসার ষোল আনা মূল্য দিতে সদাই সচেষ্ট থাকবে।

ভাবলাম, এটাই আসল নিয়ম। এটাই সাধারণতঃ হয়। এই নিয়মের জালের মধ্যে আটকে গিয়ে স্নেহ ভালবাসায় আসক্ত মানুষ সব ত্যাগ করে একদিন নিরাসক্ত শূন্য হৃদয় নিয়ে আপন অন্তরের মধ্যে ফিরে যায়। যেখানে তার কেউ নেই। যেখানে সে একা। সম্পূর্ণ একা।

গাড়ীর হুইশেল বাজল।

কামরা ছেড়ে ওরা নিচে নেমে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বস্তিবাসী মানুষের নিরব মিছিল দেখলাম। কোন শ্লোগান নেই, কোন দাবি নেই, কোন প্রতিশোধের স্পৃহা নেই। এতগুলো মানুষ শুধু একটি বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। সে বিশ্বাস— মহম্মদ আলি ওরফে আলি সাহেব।

আলিসাহেব আর সোনালী। সোনালী আর আলিসাহেব। দু' ভাই-বোনেরই চোখ জোড়া স্থির, অকম্পিত। সকলের আগে দাঁড়িয়ে পিছনের মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে ওরা। বুকে ওদের দুর্জয়

সাহস। চোখে ওদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন। মনে ওদের ভবিষ্যতের আশা।

গাড়ী নড়ে উঠল।

কিন্তু কই! ওদের মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। হুড়োহুড়ি নেই। আমাকে বিদায় জানাতে ওরা কেউ তো হাত নাড়ছে না। কারো চোখ তো ছলছল করে উঠছে না।

রিজার্ভ কামরার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি খাঁচার মধ্যে ছট-ফটিয়ে উঠলাম। জানালা দিয়ে শরীরের অনেকটা অংশ ঝুলিয়ে দিয়ে একটিবার ওদের হাত নাড়ার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু না। ওরা কেউ হাত নাড়ল না। ওরা স্তব্ধ। ওরা পাষাণ। সমস্ত লোকের মাঝে ওরা শুধু নিরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। আলি সাহেব আর সোনালীকে নিয়ে গোটা বস্তিবাসী মানুষগুলো একটু একটু করে দূরে সরে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে এত দুর্বলতা কেন? আমার প্রাণের মধ্যে এ কিসের আকুলতা? আমার শরীরের মধ্যে এ কিসের যন্ত্রণা? আমার বুকের মধ্যে এ কিসের ব্যথা?

একি আসক্তি, না ভালবাসা! একি বন্ধন, না মুক্তি! একি ব্যথা, না আনন্দ!

না। পারলাম না। ওদের মত পাষাণ হতে আমি পারলাম না। জানালা বন্ধ করে বাংকের ওপর উঠে সোনালীর পেতে দেওয়া বিছানায় মুখ ঢাকলাম।

—ঃ শেষ ঃ—